পারা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা কর্ত্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তদনুসারে ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে, কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস্ সুপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস পীকক্ গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভাতে কোম্পানির মফস্বলস্থ ফৌজদারি আদালতের এলাকা বর্দ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তাঁহারা কোম্পানির আদালতের অধীন হইব না, এই রবটী না তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন হইব না, এবং ইংরাজ জুরির সহায়তা ভিন্ন তাঁহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। ইহা কতকটা ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্যায়। ইংরাজদিগের চেম্বর অব কমার্স, ট্রেড্স এসোসিএসন, ইণ্ডিগো প্লাণ্টার্স এসোসিএশন প্রভৃতি সমুদয় সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিলেন না। তাঁহারা হরিশের ও হিন্দু পেট্রিয়টের সাহায্যে দেশের লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। দেশের মান্য গণ্য সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন। ঐ সভাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টার-দিগের নিকটে প্রেরণের জন্য এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদন পত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরেই মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্ত্তী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করা হয় নাই। এদেশীয়দিগের আবেদন পত্রের দশা যাহা হয়, ঐ আবেদন পত্রের দশাও তাহাই হইয়াছিল। রাজারা যাহা ভাল বুঝিলেন তাহাই করিলেন, আবেদনকারীদিগের ফেউ ফেউ করা সার হইল। এপ্রেল মাসে টাউনহলে যে সভা হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত বাগ্মী জর্জ্জ টমসন সাহেবের উপস্থিতি একটী বিশেষ ঘটনা। তিনি ঐ সালে আবার একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপরে বোধ হয় মিউটিনীর গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ কার্য্যসাধনের সুযোগ না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কালের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পশ্চাতে রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গের তদানীন্তন নেতা ও ডিরোজিও শিষ্যদলের অগ্রণী ব্যক্তিগণ উৎসাহদাতারূপে ছিলেন। কাহার কাহারও মুখে এইরূপ ক্ষোভের কথা শুনিতে পাই যে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশকে সুরাপানে লিপ্ত করিয়াছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না; তবে তাঁহারা যে হরিশের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা, ও পরামর্শদাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে লাহিড়ী মহাশয়ও এই উৎসাহদাতা বন্ধুদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সময়ে আমরা তাঁহাকে বারাসতে রাখিয়া আসিয়াছি। বারাসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগর কলেজে যান।

কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী রসাপাগ্‌লা নামক স্থানে টিপু সুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। টিপু সুলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ যখন তাঁহার বংশীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনেন, তখন তাঁহাদিগকে অযোধ্যার নবাবের ন্যায় কলিকাতার উপকণ্ঠেই রাখা স্থির করেন। তদনুসারে রসাপাগ্‌লা নামক স্থানে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। ইঁহাদিগকে রসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের বংশধরগণের শিক্ষার উপায় বিধানার্থ অগ্রসর হন। মহা সমারোহে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন, তখন মিঃ স্কট্ নামে একজন ইংরাজ হেড মাষ্টার ছিলেন। সে সময়ে যাঁহারা রসাপাগ্‌লা স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার ভার তাঁহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিষয় তিনি এমন সুন্দররূপে পড়াইতেন যে ছাত্রগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় থাকিত। তাঁহার ভূগোল পাঠনার রীতির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছাত্রেরা বুঝুক, না বুঝুক, ভালবাসুক, না বাসুক, তাহাদের মস্তিষ্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেই হইবে, এ রীতিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি যে বিষয় ছাত্রদিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতূহল জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। তৎপ্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া, সমগ্র বিষয়টী তাহাদের

মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; তৎপরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসু দেখিয়া সেই জ্ঞাতব্য বিষয়টী তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন। একবার তাহা উত্তম-রূপে বিবৃত করিয়া তৎপরেই আবার প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রদিগের মুখ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে বিষয়টী জন্মের মত ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। ইহার ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অন্তরে কোনও মহৎ সত্য বা উদার ভাব মুদ্রিত করিবার অবসর আসিত তাহা হইলে তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিষয়ে মন থাকিত না। এই সকল কারণে পাঠ্যগ্রন্থে পাঠের উন্নতি আশানুরূপ হইত না। সেজন্য তিনি কখন কখনও কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয়ে অধিক উন্নতি করিত না বটে, কিন্তু যেটুকু পড়িত তাহাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিত; এবং তদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া সুশিক্ষিত হইত। কেবল তাহা নহে, হৃদয় মন চরিত্রে এমন কিছু পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথের সম্বল হইয়া থাকিত। রসাপাগ্‌লাতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক যুবককে প্রকৃত সাধুতার পথ দেখাইয়া যান।

রসাপাগ্‌লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতার অতি সন্নিকটেই থাকিতেন; সুতরাং সর্ব্বদাই কলিকাতার বন্ধুদিগের সহিত গিয়া মিশিতেন। রামগোপাল ঘোষের ভবন তাঁহার নিজের বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই সেখানে গিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। সেই সূত্রে তৎকাল-প্রসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ ও আত্মীয়তা হইয়াছিল। অবশ্য তিনি সুরাপানের গোষ্ঠীতে থাকিতেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইত যে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অপর সকলকে সংযত হইয়া চলিতে হইত। কেহই অভদ্র আচরণ করিতে সাহস করিত না। আমি লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে এই সময়ে তিনি একটী বিশেষ কারণে বহুদিনের জন্য সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সম্পর্কীয় একটী যুবক অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া অতি অভদ্র আচরণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার অতিশয় লজ্জা বোধ হইল। তিনি রামগোপাল ঘোষকে বলিলেন—"দেখ রামগোপাল, আমাদের সুরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। আজ তোমার * * * এর অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি। এস আমরা সুরাপান পরিত্যাগ করি।" রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ

গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু তদবধি লাহিড়ী মহাশয় বহুকাল সুরাপান করেন নাই। পুরাতন বন্ধুদিগকে ভালবাসিতেন; সুরা-গোষ্ঠীতে থাকিতেন; কিন্তু সুরাপান করিতেন না। এ নিয়ম বহুবৎসর ছিল। পরে অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তারদিগের ও বন্ধুগণের পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার বিশ্বাস তাহাতে তাঁহার দেহ মনের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল।

রসাপাগলা হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬০ সালের প্রারম্ভে বরিশাল জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া গমন করেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে ছাত্রগণের মনে অবিনশ্বর স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রাচীন। তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে মধুবিন্দুর চারিদিকে যেমন পিপীলিকাশ্রেণী ঘোটে, তেমনি সন্ধ্যার সময় বালকগণ লাহিড়ী মহাশয়ের চারিদিকে ঘুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন; এবং কথোপকথনচ্ছলে নানা তত্ত্ব তাহাদের গোচর করিতেন। ইহার আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরস্কার সহ্য করিয়াও সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের মত সাধুতার দিকে গতি পাইয়াছে। তাঁহারা এক একজন এখন কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চিরদিন গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন; এবং এখনও তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন।

বরিশাল হইতে ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার কৃষ্ণনগর কালেজে আসিলেন। এই কৃষ্ণনগর কলেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের নবেম্বর মাসে পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। তিনি যখন পেন্সনের জন্য আবেদন করেন তখন মিঃ অল্‌ফ্রেড্ স্মিথ্ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টারের নিকট প্রেরণ করিবার সময় স্মিথ সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

"In parting with Baboo Ram Tanoo Lahiri I may be allowed to say that Government will lose the services of an educational officer, than whom no officer has discharged his public duties with greater fidelity, zeal and devotion, or

has laboured more assiduously and successfully for the moral elevation of his pupils."

অর্থ—বাবু রামতনু লাহিড়ীকে বিদায় দিবার সময় আমি বলিতে চাই যে ইনি চলিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, যাঁহার অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপরতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করেন নাই অথবা ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির জন্য অধিক শ্রম করেন নাই, বা সে বিষয়ে অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নাই।"

কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহার পত্রে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা শত শত হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বাণীর পুনরুক্তি মাত্র। যদি কোনও মানুষের সম্বন্ধে এ কথা সত্য হয়—"তিনি শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছিলেন," তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে। তিনি যে শিক্ষকতা কার্য্যে অসাধারণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়াছি যে তিনি নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষার্থীন রাখিয়াছিলেন। কোনও নূতন বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার যে ব্যগ্রতা ও জানিলে যে আনন্দ দেখিয়াছি, অন্য কোনও মানুষে সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন তিনি অশীতিপর স্থবির, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথা শুনিলে, আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিতেন; বলিতেন "রসো, রসো কথাটা লিখে নি" এই বলিয়া স্মারক-লিপির পুস্তকখানি বাহির করিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে ছাত্রগণকে যখন শিক্ষা দিতেন, তখন কোনও বালক যদি কখনও তাঁহার কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত বা তাঁহার কৃত কোনও ব্যাখ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা দিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি শিশুর ন্যায় বিনীতভাবে শুনিতেন, এবং ব্যাখ্যাটী উৎকৃষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই কৃষ্ণনগর কলেজে শেষ অবস্থানকালের কয়েকটী গল্প শুনিয়াছি: একবার লাহিড়ী মহাশয় পাঠ্য বিষয়ের কোনও এক অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটী বালক বলিল, "মহাশয়, ওটার মানে ত ওরকম নয়।" তিনি অমনি তন্মনস্ক, "সে কি? তুমি কি আর কোনও অর্থ জান না কি?" তখন বালকটী আর এক প্রকার ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাখ্যা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন, "এ মানে তুমি কোথায় পেলে?" অনুসন্ধানে জানিলেন,

তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয়া দিয়াছেন। তখন প্রীত হইয়া বলিলেন—"এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যার ঘরে তার ভাবনা কি?" আর একটী গল্প ইহা অপেক্ষাও সুন্দর। একবার একটী বালক তাঁহার প্রদত্ত কোনও ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল। তখন তিনি আর এক বার অধিকতর বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন অন্যতম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন;—"তুমি আমার ক্লাসের ছেলেদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেও।" তখন ছাত্রমহলে, ছাত্রমহলে কেন দেশের শিক্ষিতদলে, সুপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া মহা খ্যাতি ছিল। তিনি আসিয়া যখন বিষয়টী ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"দেখিলে আমি ঠিক ব্যাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে ওঁর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্যা নাই, তাই অমন সুন্দর করে বুঝাতে পারি নাই। ওঁর মত কয়টা মানুষ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী জানে?" বাস্তবিক ইংরাজী বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বার্দ্ধক্যে ইংরাজী ভাষায় কোনও বিষয় লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরাজী জান কি না!"

তাঁহার এই সময়ের শিক্ষকতা সম্বন্ধে আর একটী কথা শুনিয়াছি, তাহা বোধ হয় শিক্ষকতা কার্য্যের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার চরিত্রে ছিল। অনেক শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদিগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন। নিজে যা জানেন না, সেটাও জানেন এইরূপ দেখান, এবং কোনও রূপে যোড়াতাড়া দিয়া, গোঁজা মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস পান। বলা বাহুল্যমাত্র যে লাহিড়ী মহাশয় এরূপ আচরণকে অতি নিন্দনীয় মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন করিলে, যদি তাহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন মনে করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন—"দেখ এটা আমার জানা নাই, জানিয়া কাল তোমাকে বলিব।" তৎপরে গৃহে গিয়া সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন, বা বিশ্রামগৃহে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানিয়া লইতেন। পরে আসিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে জানাইয়া দিতেন।

যতদূর জানা যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং কৃষ্ণনগরে আসিয়াই তাঁহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইতে হয়। ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতার সন্নিকটে বালী উত্তরপাড়াতে ছিলেন। সেখান

হইতে কৃষ্ণনগরেই গমন করেন, এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পেন্‌শন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। ১৮৫৭ সালের চৈত্রমাসে বৃদ্ধ পিতা রামকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করেন। লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবতার নাম করিয়াই দিন যাপন করিতেন। তাঁহার অবসান কাল সেইরূপ সাধুর প্রস্থানের উপযুক্তই হইয়াছিল। অপর দুই ঘটনা তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম। দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের ১৮৫৯, খৃষ্টাব্দে ৩রা ভাদ্র দিবসে কলিকাতা সহরে জন্ম হয়। ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান।

১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত।

এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে যে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দু-কালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, মধুসূদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে নব আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বৎসর আপনার কাজ করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। এই কালের মধ্যে নববঙ্গের কয়েকজন নূতন নেতা দেখা দিয়াছিলেন, এবং বঙ্গবাসীর চিত্ত ও চিন্তাকে নূতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। আপাততঃ তাঁহাদের কার্য্যের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায়

বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় মানব-চক্ষুর গোচর হইল। ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন করিবার আশয়ে সহর ত্যাগ করিয়া হিমালয় শিখরে গমন করেন। ১৮৫৮ সালের শেষভাগে তিনি সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের ন্যায় হইল। উভয়ে মিলিত হইয়া নব নব কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন।

১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল। এক দিকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাঁহার চিরস্মরণীয় উপদেশগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখনও শোনে নাই। সুতরাং সহরে ত্বরায় এই জনরব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ব্রাহ্মসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীর লোক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়া আমরা সাতদিন মন স্থির রাখিতে পারিতাম না। হৃদয়ে কি নব ভাব জাগিত! চক্ষে কি নূতন জগত আসিত! এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হউক একদিন হইবেই হইবে। এমন সুন্দর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না হইলে ভাষার দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য।

অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উৎসাহাগ্নি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একাকী ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার পদবীর অনুসরণ করিয়া তাহার যৌবন-সুহৃদগণের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাদের প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাহ্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে কয়েক প্রকার কার্য্যের আয়োজন করিলেন। প্রথম যুবকগণের ধর্ম্ম শিক্ষার্থ ব্রাহ্মবিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতে ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত; তাঁহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে

উপদেশ দিতেন। ঐ সকল উপদেশ দ্বারা অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তদগ্রেই যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কেশব এক সুহৃদ্গোষ্ঠী স্থাপন করিলেন; সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের জন্য বসিতেন। সেখানে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগের সুহৃদ্গোষ্ঠীর সঙ্গত সভা নাম দেখিয়া ইহার নাম সঙ্গত সভা রাখিলেন। এই সঙ্গত সভা ব্রাহ্মসমাজের নবশক্তির অদ্ভুত উৎসস্বরূপ হইল। যুবকসভ্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আত্মোন্নতি প্রার্থী হইয়া সঙ্গতের আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত, তাহা সর্ব্বতোভাবে আচরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত; তাঁহাদের জ্ঞান থাকিত না; রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়া হয়ত ২টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; কোথা দিয়া যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না। এরূপ আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যানুসরণে চিত্তের একাগ্রতা, এরূপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিয়া এক ঘনিবিষ্ট মণ্ডলী সৃষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চিরদারিদ্র্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবং এখনও ইঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

সঙ্গত সভার সভ্যগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। এই ভাব অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে দিলেন। এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলে অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া

নানা প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

নবীন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল; কলিকাতা কলেজ নামে এক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; তাহা নবীন ব্রাহ্মদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল; এবং সর্ব্ববিধ সদালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলেই নারীজাতির উন্নতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটী প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনুসারে নবীন ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্নী বা ভগিনীর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটী স্ত্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নানা উপায় অবলম্বন করেন; এবং তাঁহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। সে পত্রিকা অদ্যাপি রহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।

১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্য একটী স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখা দিলেন; তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্নীকে নববেশে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ্যস্থানে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা লইয়া চারিদিকে মহা সমালোচনা আরম্ভ হইল। এই কালের শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্নীকে লইয়া গবর্ণর জেনেরালের বাড়ীতে বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল।

যাহাহউক প্রাচীন দলের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, ইঁহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্য্যের একতা বহুদিন রহিল না। নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্য্যতঃ উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র করিলেন; "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল।

১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল মহোৎসাহে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বার্ত্তা ভারতের নানা প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চর্চ্চার অনেক অংশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান দ্বারা বঙ্গসমাজে যখন আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখা গেল। ইহার কিছু পূর্ব্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি হিন্দুপেট্রিয়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে হাঙ্গামার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্পাধিক পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬০ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না;

ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না; নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। এই নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়া লংএর কারাগার প্রভৃতির বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁহার নাটক সকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। এই নূতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃহণীয় হইল। পর পরিচ্ছেদে মিত্র মহাশয়ের জীবন-চরিতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে তিনি কর্ম্মসূত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাঁহার ন্যায় নানা স্থানে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার এই ভূয়োদর্শন তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র সকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার বিবরণ তাঁহার জীবন-চরিতে দেওয়া গেল।

দীনবন্ধু যেমন তাঁহার নাটকগুলির দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যে নবভাব ও বাঙ্গালির মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এইকালের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দিলেন;—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় পদ্য সাহিত্যকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব আকাঙ্ক্ষা ও নব শক্তির অবতারণা করিলেন, গদ্য সাহিত্যে সেই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্কিম চন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। তৎপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃত-বহুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারী হইয়া ধনীগৃহের রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কারভাবে প্রপীড়িতা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও একদল ইংরাজী শিক্ষিত কাব্যানুরাগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাভারে পীড়িত বঙ্গভাষাকে কিরূপে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এবং কিরূপে তাঁহারা আলালী ভাষা নামে একপ্রকার তাজা তাজা বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার যে এই নব ভাষার জন্মদাতা ছিলেন; এবং তাঁহাদের প্রকাশিত "মাসিক পত্রিকা" যে এই ভাষার

ভেরীনিনাদ ছিল, তাহাও অগ্রে নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু ঐ "আলালী" ভাষা গ্রাম্যতা দোষে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথা "টক্ টক্ পটাস্ পটাস মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়া নেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।" ইত্যাদি ভাষা যে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং এই আলালী ভাষা বঙ্গীয় পাঠক বৃন্দের সম্পূর্ণ ভাল লাগিত না।

ইহার পরে হুতোমের নক্‌সা প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নক্‌সা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও গ্রাম্যতা দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই।

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়। ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিরূপে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহাদের দর্পণ নামক পত্রের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু "দর্পণ" ইংরাজদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষা ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত। প্রকৃত পক্ষে রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বারা লিখিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শক। তিনিই ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুদী" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ

করেন। ঐ "কৌমুদীতে" জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোক-শিক্ষার একটী প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ লইয়া হিন্দু সমাজের সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষগণ "চন্দ্রিকা" নামক প্রত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষাতে ও সংস্কারার্থীদিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৌমুদী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দ্রিকা তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে; এবং তদ্দ্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাই তাহার মুখ্য কার্য্য ছিল। দৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার "প্রভাকর," "ভাস্কর" প্রভৃতি পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। 'ভাস্কর' গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিকা হইতে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়;—যথা, মহাজন দর্পণ, চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞান দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, রস-সাগর, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, রসমুদ্গর, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, ও দুর্জ্জন দমন মহা-নবমী।

ইহাদের অধিংকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। প্রভাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটূক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কাণে হাত দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাস্করের পদবীর অনুসরণ করিয়া "রসরাজ" ও "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ভ করিল যে তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সুখের বিষয় অচির কালের মধ্যে দেশের লোকের নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়া গেল।

বোধ হয় এই ছি ছি রবটা হৃদয়ে থাকাতেই এসময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িতে বা বাঙ্গালা লিখিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজী পত্রের মধ্যে হরিশের Hindoo

Patriot, রামগোপাল ঘোষের Bengal Spectator, কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindoo Intelligencer, কিশোরীচাঁদ মিত্রের Indian Field সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবটা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি রব নিবারণের আরও চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও তৎপরে পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত "রহস্য-সন্দর্ভ" বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। তাহা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্তপত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে।

সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কালেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত বটে, কিন্তু তাহা "আলালী ভাষাতে" লিখিত হইত, ইহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহির করিল, বলিয়া একটা রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গাম্ভীর্য্য। সংবাদ পত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল। বিদ্যাভূষণ জানিতেন তাঁহার উক্তির মূল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক হইল, কিন্তু মূল্য হইল বার্ষিক দশ টাকা; তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব মাধ্যন্দিন রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই কারণেই এই কালের মধ্যে তাহার উল্লেখ করিলাম।

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতির চর্চ্চা বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু তদানীন্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে পারেন নাই। ভিতরকার কথাটা এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদ পত্রের

প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশতঃ নির্ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। সেই তেজস্বিতা, সেই মনুষ্যত্ব, সেই ঐকান্তিকতা, সেই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সেই সত্য-নিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য সামাজিক ঘটনা হোমিওপেথি রাজ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। কলিকাতা সহরে হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ও তৎসম্বন্ধে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ রাজা বাবুর কার্য্য বিষয়ে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছি। ডাক্তার বেরিনি সাহেবকে অবলম্বন করিয়া রাজাবাবু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাঁহারই সংশ্রবে আসিয়া অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকে পরে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশ বিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্ত্তা লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্ব্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন। এলোপ্যাথির সহিত তুলনায় হোমিওপ্যাথি উৎকৃষ্টতর লোকের এ সংস্কার যে জন্মিল তাহা নহে, কিন্তু মত পরিবর্ত্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল; এবং বঙ্গবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়া দিয়াছিল। এই সাহসী, সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মানুরাগী পুরুষের জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কালেজ হইতে এম্, ডি, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। ঐ সালেই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্ত্তীর প্রযত্নে, ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএ-শনের বঙ্গদেশীয় শাখা নামে একটী শাখা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির নিন্দা করেন। ঐ নিন্দাবাদ রাজা বাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেন্দ্রলালের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু ইণ্ডিয়ান ফীল্ড্ নামক কাগজের জন্য মহেন্দ্রলালকে (Morgan) মর্গান সাহেবের লিখিত

হোমিওপেথি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন। সমালোচনার্থ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেন্দ্রলালের মনে হয় যে কার্য্যতঃ হোমিওপেথি চিকিৎসা কিরূপ তাহা না দেখিয়া সমালোচনা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজা বাবুর সহিত তাঁহার-কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এবং চিকিৎসা দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হোমিওপেথিক চিকিৎসা প্রণালীই উৎকৃষ্টতর প্রণালী বলিয়া মনে হইল। ১৮৬৬ সালের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট কারণ পাইলেন তখন সহরের এলোপেথিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্ত্তা প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকাল এসোসিএশনের চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তাহাতে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর অনির্দ্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন করিয়া হানিম্যান প্রদর্শিত প্রণালী উৎকৃষ্টতর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আর কোথায় যায়! সাপের লেজে যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়ালার্ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, "ডাক্তার সরকার থাম থাম, আর একটী কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে বাহির করে দেব।" তৎপরে সহরের এলোপেথি দল ডাক্তার সরকারকে একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক সভা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গভূমি যেন এই বীরের পদভরে কাঁপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, বাঙ্গালি যে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা এই:সকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্ বীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে।

মহেন্দ্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপেথিকে কিরূপ উঁচু করিয়া উঠাইলেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটী কথাতেই প্রকাশ। তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার হোমিওপাথ বন্ধুগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক সভা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিণি, অপরাপর কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্য যখন উদিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোভা পায়। মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদিত হইয়াছেন, এখন আমার অস্তগমনের সময়"! অতএব

অপরাপর নেতাদিগের ন্যায় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীর ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপেথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা "ন্যাসনাল পেপার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটী প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলম্বনের দিকে আনা কর্ত্তব্য। লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হয়, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। এজন্য তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদ পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন; বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ করিতেন; এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। এই চিন্তার ফলস্বরূপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চর্চ্চা, স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ, প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটী মেলা খোলা স্থির হইল। দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যায়।

অতএব উদ্যোগকর্ত্তৃগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ত্রুটী করেন নাই।

১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত "গাও ভারতের জয়" সুগায়কদিগের দ্বারা গীত হয়; আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি; গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন; এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত মনোমোহন বসু মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণন করেন—"ভারতবর্ষের এই একটী প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্য্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? * * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয় এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ইহার পরে মনোমোহন বসু প্রভৃতি জাতীয় সংগীত রচনা করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায়, সংগীত রচনা করিয়া দুঃখ করিলেন;—

কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে; ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়।

এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা সমাজ নানা তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা

সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের অভ্যুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীন-বিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবির্ভূত করিয়াছিল সেইরূপ ঢাকাতেও শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটী আনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে কে মুসলমানের রুটী খাইতে পারে বা কে চর্ম্মপাদুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া খাইতে পারে।

ক্রমে ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পূর্ব্ব বঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, ততই ঢাকা সহরে নব নব কার্য্যের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, বিধবা বিবাহের আন্দোলন প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দিল।

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন, ভগবানচন্দ্র বসু, অভয়াচরণ দাস, ঈশ্বর চন্দ্র সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর দীননাথ সেন, ও পরবর্ত্তী সময়ের কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয়াছিলেন, দুই ব্যক্তি। প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা ব্রজসুন্দর মিত্র, দ্বিতীয় কৌলীন্য প্রথার সংস্কার প্রয়াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; এবং অপরেরা অগ্রসর হইয়া তাহার ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। এই কালের মধ্যে ঢাকাতেও ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতি বিষয়ক বিষয়ের আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল; এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়াছিল। সেই

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত দেওয়া যাইতেছে :—

ব্রজসুন্দর মিত্র।

এই সাধু পুরুষ বাঙ্গালা ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইয়া তাঁহাকে বাল্যকাল পরাশ্রয়ে ও পরগৃহে যাপন করিতে হয়। তৎপরে ইংরাজী শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আসিয়া ঘোর দারিদ্র্যে ও কঠোর সংগ্রামে কাল যাপন করেন। শিক্ষা সাঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই সামান্য বেতনে কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাতে এরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মভীরুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছিল যে অচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়া তিনি উচ্চপদে আরোহণ করেন। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতির বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইতে থাকে। তাঁহার দৃষ্টি প্রথম ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১২৫৩ বা ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপয় বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া ঢাকা নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন; এবং আত্মীয় স্বজনের নিবারণ ও ভয় প্রদর্শনের মধ্যে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পরে মিত্রজ মহাশয় সার্ভে ডেপুটী কালেকটরের পদে উন্নীত হইয়া কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাহাতে কিছু দিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ বাসের জন্য ঢাকাতে একটী বাড়ী ক্রয় করেন এবং তাহার একাংশ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য রাখেন। সেই সময়ে তাঁহারই উৎসাহে এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটী স্কুল স্থাপিত হয়; এবং কলিকাতা সমাজ হইতে প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্ত ঐ স্কুলের একজন শিক্ষক রূপে এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সহকারী রূপে প্রেরিত হন। ইহা বোধ হয় ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে ঘটিয়া থাকিবে। এই প্রচারক দ্বয়ের আবির্ভাব পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদলে নবভাবের উদ্দীপনা করিল। তাহারা দলে দলে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই আন্দোলন দেখিয়া প্রাচীনদলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের কার্য্যে নিরুৎসাহ হইলেন; কিন্তু ব্রজসুন্দর বাবু পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি সমান ভাবে যোগ দিয়া রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবাবিবাহের

আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ এই কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিতদলের মধ্যে একটী বিধবাবিবাহের দল দেখা দেয়। তাঁহারা কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া এই সংস্কারকার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি যেখানে গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন।

১৮৬২ সালে ব্রজসুন্দর বাবু স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য সকল আয়োজন করেন, কেবল তাঁহার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতেই সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে উত্তরকালে জননী পরলোকগতা হইলে তিনি স্বীয় কন্যাগণকে সুশিক্ষিতা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন।

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজসুন্দর বাবুর উৎসাহেও তাঁহার বন্ধুগণের সাহায্যে ঢাকাতে একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যাহা পরে ১৮৭৫ সাল হইতে 'ইডেন ফিমেল স্কুল' নামে পরিচিত হইয়াছে। ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কিরূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত "নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নারীজাতির উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে প্রভূত বল লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ সালে ব্রজসুন্দর বাবু স্বীয় গ্রামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং অপরাপর প্রকারে কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন। এই রূপে নানা সৎকার্য্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকাতে যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিলেন তাহা আর থামিল না। কলিকাতার অনুকরণে ঢাকাতেও যুবকদলের জন্য একটী সঙ্গত সভা স্থাপিত হইল; এবং সেই সঙ্গতে বসিয়া যুবকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ১৮৬৫ সালে তিনি ঢাকাতে পদার্পণ করিলেন। যে উন্মাদিনী বক্তৃতাশক্তি কলিকাতার যুবকদলকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল তাহা ঢাকা ও ময়মনসিংহের যুবকগণকে মাতাইয়া তুলিল। দলে দলে যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে ধাবিত হইল। ইহার মধ্যে একটী মুসলমান যুবককে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ঢাকা সঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাঁহাকে লইয়া পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাহা লইয়া ঘরে ঘরে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। ব্রাহ্মদের ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। এমন কি মাঝি মাল্লারাও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে তুলিতে ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারিল না। এই সকল আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নূতন উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় গিয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে ঢাকাতে যেমন এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়া ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইল, তেমনি সর্ব্ববিধ সমাজ-সংস্কার কার্য্যে উৎসাহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কলিকাতার সোমপ্রকাশের ন্যায় "ঢাকা প্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দপ্রসাদ রায় নামক একজন উদারচেতা ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইল। তিনি উন্নতি-শীল দলের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া ইহাতে সর্ব্ববিধ অগ্রসর মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত, ব্রাহ্ম যুবকদিগের সাহসিকতা, এই সকলে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণী সভা, ও "হিন্দু হিতৈষিণী" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইল। একদিকে "ঢাকা প্রকাশ" অপর দিকে 'হিন্দু হিতৈষিণী' এই উভয় পত্রে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে সজাগ করিয়া তুলিল।

এই কালের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পূর্ব্ব-বঙ্গসমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি কৌলীন্য ও বহুবিবাহপ্রথার উন্মূলনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মহা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

১২৩২ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশা গ্রামে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া স্বীয় পিতৃব্যের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হন। বিদ্যা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে ইংরাজী শিক্ষা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা শিক্ষাও ভাল হয় নাই। ইঁহার পিতৃব্যও বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না ; তিনি দারিদ্র্যের তাড়নায়, স্বীয় কৌলীন্যের সাহায্যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৮টী কুলীন কন্যার সহিত পরিণীত করেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ ঋণভার মস্তকে লইয়া রাসবিহারীকে স্বীয় পিতৃব্য

হইতে পৃথক্ হইতে হয়। এই অবস্থাতে ঘোর দারিদ্র্যে পড়িয়া রাসবিহারী আরও ছয়টী কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; এবং অর্থোপার্জ্জনের আশয়ে ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের অধীনে তহসিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

ঐ কাজ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় মনের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা রচনা করিবার ও গান বাঁধিবার বাতিক ছিল। তাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে এবং কবিতাদি প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। উপর্য্যুপরি কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থও প্রণয়ন করেন, এবং তাহার কয়েকখানি শিক্ষাবিভাগেও আদৃত হয়। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় নারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠে; এবং শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তাহার সারাংশ বাঙ্গালা কবিতাতে গ্রথিত করেন। এই সময় হইতে কুলীন কন্যাদিগের দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি তাহাদের দুঃখ বর্ণনা করিয়া সংগীত রচনা পূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে, কুলীনদিগের প্রধান প্রধান স্থানে, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে তিনি আপনার হৃদ্গত ভাব "বল্লালী-সংশোধিনী" নামে একটী বক্তৃতাতে প্রকাশ করিয়া তাহা মুদ্রিত করিলেন! চারিদিকে আন্দোলন উঠিয়া গেল। এই নেশা তাঁহাকে দিন দিন এতই ঘিরিয়া লইতে লাগিল যে, তিনি আপনার তহসিলদারী কর্ম্ম আর রাখিতে পারিলেন না; সামান্য গ্রন্থাদির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে সভা সমিতিতে ঐ একই কথা বলিয়া ফিরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি সর্ব্বত্রই নির্য্যাতন ভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিণামে তাঁহার বিশুদ্ধচিত্ততা ও চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। "ঢাকাপ্রকাশ" "হিন্দুহিতৈষিণী" প্রভৃতি, এবং কলিকাতা হইতে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও "সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা" প্রভৃতি তাঁহার সপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে ও সাহায্যে বহুবিবাহ নিষেধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন প্রেরিত হয়, দুঃখের বিষয় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই। ১২৮২ সালে কুলের পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তৎপরে ১২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পুত্র ও

কন্যার বিবাহ দেন। সদ্দৃষ্টান্ত বৃথা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় ইহার অল্প পরেই ১২ জন নৈকষ্য কুলীন, ও ৮ জন শ্রোত্রীয় তাঁহার পদবীর অনুসরণ করেন। এই সকল সংস্কার কার্য্যে ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩০১ সালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ভয় হয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সংস্কার কার্য্য বা বিলীন হইয়া গেল। এ সকল ঘটনা পরবর্ত্তী সময়ে ঘটিলেও এখানে উল্লেখ করিলাম।

এই কালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অপরাপর স্থানেও ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে বরিশাল সর্ব্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাস মহাশয় এই সময়ে বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের অনুরাগী লোক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি আধাআধি কোনও কাজ করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা প্রাণ দিয়া করিতেন, ক্ষতিলাভ গণনা করিতেন না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি যখন তাঁহার অনুরাগ জন্মিল তখন তিনি বরিশালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্বীয় ব্যয়ে কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মপ্রচারককে সপরিবারে বরিশালে লইয়া গেলেন; এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মপরিবারের নারীগণের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবব্রাহ্মপ্রচারকদিগের সমাগমে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বরিশালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রীজাতিকে সামাজিক স্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। অনেক বিধবার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল; তন্মধ্যে দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্ব্বপ্রধানরূপে উল্লেখ-যোগ্য। নিজে উদ্যোগী হইয়া বিমাতার বিবাহ দেওয়া ইহার পূর্ব্বে ঘটে নাই, হয় ত পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কার্য্যে শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে লাখুটিয়ার জমিদার পরিবারের একজন যুবক স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবের বাড়ীতে আহার করিতে গেলেন। তাহা লইয়াও সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন চলিল। বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এই সমুদয় চেষ্টা ও আন্দোলন প্রধানতঃ ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত, এই কালের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বিভাগে যে জাতীয় জীবনের সঞ্চার দেখা গিয়াছিল তাহাও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে বসিবার পূর্ব্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তখন রঙ্গপুর মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে রঙ্গপুর কিছুদিন পশ্চাতে পড়িয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক রঙ্গপুর বিভাগে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা কখনই বিরত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেই সুযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ন্যাথানিয়েল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া "রঙ্গপুর জমিদার দিগের স্কুল" নামে একটী স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ জমিদারস্কুলের ছাত্রগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, এই কালের প্রথম ভাগে, গবর্ণমেণ্ট নিজে ঐ স্কুলের ভার লইয়া তাহাকে রঙ্গপুর জেলা স্কুলে পরিণত করেন। তৎপরে পরবর্ত্তী সময়ে ঐ স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করা হইয়া-ছিল, পরে কালেজ ক্লাস আবার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রঙ্গপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দিকেও উন্নতির স্পৃহা দৃষ্ট হইতে থাকে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্তঃপুষ্করিণীর জমিদার রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এবং "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রঙ্গপুর বার্ত্তা-বহ পরে কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে যায় এবং তিনি ইহাকে "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। যে কালের আলোচনা করিতেছি সে সময়ে কাকিনাই রঙ্গপুরের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও সদনুষ্ঠানাদির জন্য প্রধান স্থান হইয়া উঠে। প্রথমে শম্ভুচন্দ্র, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজা মহিমারঞ্জন, ঐ সুখ্যাতি অর্জ্জনের প্রধান কারণ হইয়া উঠেন। শম্ভুচন্দ্রের সমুদয় কীর্ত্তির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালা ১২৭০ সালে মহিমারঞ্জন কাকিনাতে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ রঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত হইয়া ইহাকে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙ্গপুর সহরেও একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত এবং ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের কিঞ্চিৎ ম্লানতা হইয়াছিল। আবার রঙ্গপুর মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লাহিড়ী মহাশয় যখন রসাপাগলা হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়া শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে পাঁচটী প্রবল শক্তি দেখা দিল। ইহার আভাস পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয়, দ্বিতীয় শক্তি দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকাব্যের অভ্যুদয়; তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব; চতুর্থ শক্তি সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়; পঞ্চম শক্তি চিকিৎসা-জগতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অভ্যুদয়। পাঁচটী মানুষ, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও মহেন্দ্রলাল সরকার এই কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিত্তকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরিচ্ছেদে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেওয়া যাইতেছে;—

কেশবচন্দ্র সেন।

কেশবচন্দ্র সেন হুগলী জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌরীভা-নিবাসী ও কলিকাতার কলুটোলা-প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ দিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইঁহার জন্ম হয়। যাঁহারা প্যারীমোহন সেনকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ও পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রসন্নমূর্ত্তি। কেশবচন্দ্র পিতার ভক্তির-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জননীদেবীও সদা-শয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র এই পিতা মাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শান্ত, শিষ্ট, সাধুতানুরাগী, হ্রীমান বালক ছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম যখন অনুমান ছয় বৎসর তখন ইঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা প্যারীমোহন সেনও এলোক হইতে অবসৃত হন। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র ছিল। পিতৃবিয়োগের পর, জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ইঁহাদের অভিভাবক হন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানের অধীনে কেশবচন্দ্র বর্দ্ধিত হন।

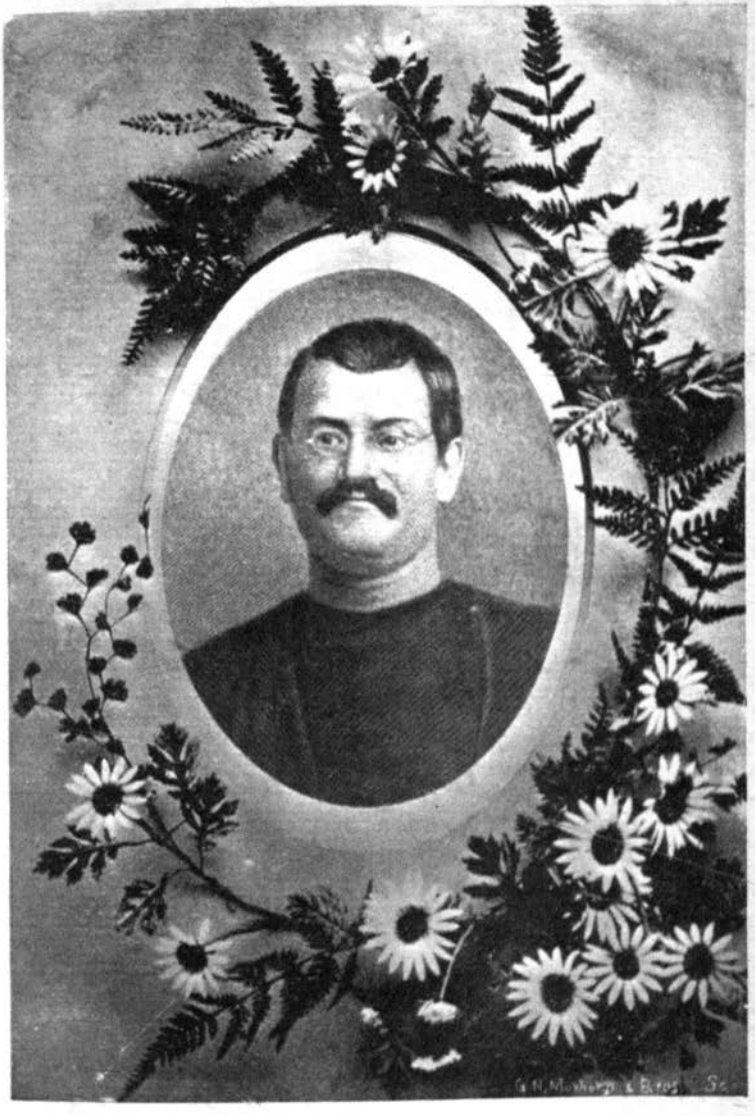

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন।

(২৬৬ পৃষ্ঠা

B. Kar, Bee Press.

১৮৪৫ সালে সাত বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৫২ সালে হিন্দুকলেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের ফলস্বরূপ খ্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৫৩ সালে মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয় এই বিবাদে "রাজা বাবুর" পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সুতরাং তিনি কেশবচন্দ্রকে হিন্দু-কলেজ হইতে তুলিয়া লইয়া উক্ত কলেজে দিলেন। ১৮৫৪ সালে মেট্রপলিটান কলেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্দ্র আবার হিন্দুকলেজে আসিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে একবার বার্ষিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে লিপ্ত হওয়াতে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। শান্ত, সুধীর, সর্ব্বজন-প্রিয় কেশবচন্দ্রের মনে ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। চিরদিন তাঁহার আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান অতিশয় প্রবল ছিল। সুতরাং এই অপমান তাঁহার প্রাণে শেল-সম বাজিল; তিনি সমবয়স্কদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর বিষাদের মধ্যে পতিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আত্মোন্নতির জন্য ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান করি ইহাই তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১৮৫৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারি ড্যাল সাহেব ও সুবিখ্যাত পাদরী লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঐ সভার অপরাপর কার্য্যের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাস ভবনে বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ একটী সায়ংকালীন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র কতিপয় বয়স্যের সহিত সেখানে প্রতিদিন বালকদিগকে পড়াইতেন। আমার সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী কেহ কেহ এই ১৮৫৬ সালে, ঐ স্কুলে সন্ধ্যার সময় পড়া করিতে যাইত। আমি তাহাদের মুখে তখনি কেশবচন্দ্রের প্রশংসা শুনিতাম।

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুলীন বৈদ্যপরিবারস্থ চন্দ্রকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৫৭ সাল হইতে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মোৎসাহ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঐ সালে তিনি পূর্ব্বোক্ত যৌবন-সুহৃদগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার ভবনে Good Will Fraternity নামে এক সভা

স্থাপন করিলেন। ঐ সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্ম্মাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেন; এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতেন বা মৌখিক বক্তৃতা দিতেন। এই সভাতে তাঁহার ভাবী বাগ্মিতার সূত্রপাত হইল; এবং এখান হইতেই একদল যুবক তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই সভার সম্বন্ধ-সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সত্যেন্দ্র বাবুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন; এবং যুবক কেশবের ধর্ম্মানুরাগ ও ভাবী অসাধারণ বাগ্মিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হন।

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে যাপন করিবার উদ্দেশে সিমলা পাহাড়ে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই সংবাদে পুলকিত হইলেন; এবং তাঁহার যৌবন-সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্রকে সাদরে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা—এই উভয়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক নব শক্তির সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র ঐ সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্ত্তা ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ সালে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন।

এই সময়ে মহাসমারোহে সিন্দুরীয়া পটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত "বিধবা বিবাহ" নাটকের অভিনয় হয়। কেশবচন্দ্র তাহার প্রধান উদ্যোগী ও কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। এই অভিনয়ের বাতিকটা তাঁর বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকালে বয়স্যদিগকে লইয়া নানা বিষয়ে অভিনয় করিতেন।

অনুমান ১৮৫৯ সালে সঙ্গতসভা নামে ধর্ম্মালোচনা সভা স্থাপিত হয়

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বয়স্যগণ এই সভাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বিশ্রম্ভালাপে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিতেন। তাঁহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন হইত।

১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া সিংহল যাত্রা করেন; এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাস যাপন করিয়া আসেন। এই বিদেশযাত্রা ও একত্র বাস দুই নেতাকে সুদৃঢ় প্রীতি-সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিল।

কেশবচন্দ্র দেশে ফিরিলে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটী ৩০ টাকার চাকুরী লইয়া কর্ম্ম কাজে বসিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে রত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। তখন তাঁহার প্রাণে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাঁহার জীবনের কাজ তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে! কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম্মে বসিলেন বটে, কিন্তু অবসর কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। Young Bengal, this is for you, নামক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা সকল ইহার পর বৎসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ইহার পর বৎসর তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে Indian Mirror নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; এবং "কলিকাতা কালেজ" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই স্কুলগৃহ এই যুবকমণ্ডলীর একটী প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিলেন। ঐ সালেই ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। ঐ সালের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারীর নব-প্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। বোধ হয় ইহার কিছুকাল পরে দেবেন্দ্র নাথের পিতা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধও ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। এই সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান যুবকদলের মধ্যে এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিল। কলিকাতার বাহিরে ও অনেক স্থানে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি ও তন্নিবন্ধন যুবকদিগের প্রতি নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইল।

ত্বরায় সঙ্গত-সভার সভ্যদিগের মধ্যে এক নব ভাবের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার সত্যসকলকে মুখে রাখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ

ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; এবং তন্নিবন্ধন গৃহতাড়িত হইয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে ব্রাহ্ম যুবকগণ পৌত্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হওয়াতে আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল।

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কলিকাতা সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন; এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত দিবস তিনি স্বীয় পত্নীকে ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া যান। তাঁহার অভিভাবকগণ এ কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে যে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পত্নীকে দিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে অপরের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না। তিনি আপনার অভীষ্ট সাধন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল। এই অবস্থাতে তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে অনেক দিন দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মধ্যে বাস করিতে হইল। তাহাতে উভয়ের প্রীতিবন্ধন আরও দৃঢ় হইল। তৎপরে স্বীয় অভিভাবকদিগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপ্য সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও পৈতৃকভবনে পুনঃ-প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল।

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তাঁহার পরিবারে প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্রের নামকরণ নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল।

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে গিয়া তিনি যে বক্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রত্য পাদরী ডাইসন্ সাহেবের সহিত বিবাদ বাঁধিয়াছিল। সে বিবাদ আর মেটে নাই। খ্রীষ্টীয় সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি গালাগালি চলিতেছিল। ১৭৬৩ সালের প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত এক পত্রিকাতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অনেক উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পায়। তদুত্তরে কেশবচন্দ্র Brahmo Samaj Vindicated ("ব্রাহ্মসমাজের পক্ষসমর্থন") বলিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাতে তাঁহার যে বাগ্মিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডফ সাহেব উক্ত বক্তৃতাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাহ্মসমাজ

যে শক্তি লইয়া উঠিতেছে তাহা সামান্য শক্তি নহে। বলিতে গেলে এই বক্তৃতা হইতেই কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বঙ্গসমাজে স্থাপিত হইয়া যায়।

এই বৎসরে তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার সভ্যগণ উৎসাহের সহিত নানা হিতকর বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন।

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র একজন বয়স্য সহ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচারার্থ গমন করেন। তদবধি সে সকল প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে একটী প্রধান সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপূর্ব্বে উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে আসীন হইয়া উপাসনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। কেশব-চন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দুইজন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যকে সেই পদে নিয়োগ করিলেন। এতদ্দ্বারা সমাজের প্রাচীন সভ্যগণের মনে বিরাগ জন্মিল। তাঁহারা মহর্ষির নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ওদিকে যুবকদল আর একটী অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অসমবর্ণের দুই ব্যক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি হাজার অনুরক্ত হইলেও, নিজে তৎপূর্ব্বে উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, এবং যুবকদলকে বিধিমতে উৎসাহদানে ইচ্ছুক থাকিলেও, এরূপ সমাজবিপ্লবসূচক কার্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তখন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা যুবকদলের হস্তে ছিল। তাহাতে এই বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া ভীত হইলেন; এবং যুবকদলকে সমাজ-সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্ব হইতে অন্তরিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কেশবচন্দ্র দেখিলেন ঘোর ঝটিকা আসিতেছে, তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা সমাজের কর্তৃত্বভার তাঁহার হস্তের বাহিরে যায় দেখিয়া, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া নিজ হস্তে রাখিবার জন্য "ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা" নামে এক সভা গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন; এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যে কতিপয় যুবা বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে লইয়া মহোৎসাহে প্রচার বিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই গোলমালের মধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। ১৮৬৪ সালের সুপ্রসিদ্ধ ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসনা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে উঠিয়া গেল। সেখানে যে দিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সে দিন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য্যদ্বয় গিয়া দেখেন যে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বকার উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তাঁহাদের অনেকে সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া উপাসনা করিলেন। বলিতে গেলে এই সময় হইতেই প্রকাশ্য গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার পর কেশবচন্দ্র অনেক দিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চরমে শান্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত হইল।

ত্বরায় তিনি কলিকাতা সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই পদে দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিযুক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষতা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতিনিধিসভাকে প্রধান যন্ত্ররূপে আশ্রয় করিলেন। তাহার সাহায্যে একটী ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যুবকদলের অভিসন্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। কিন্তু সর্ব্ববিধ উন্নতিকর প্রস্তাবে সহায়তা করিতে বিরত হইলেন না। যুবকদল আত্মোন্নতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধিমতে সাহায্য করিতেন। এমন কি যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে একবার তিনি "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে সমাজের বেদীতে উপবীতধারী উপাচার্য্যগণকে বসিতে না দেওয়া হয়; এবং যদি এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া হয়। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে যাঁহারা বহুকাল সমাজের সহিত যোগ দিয়া অনুরাগের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে এক্ষণে স্বাধিকার-চ্যুত করা তিনি পক্ষপাতের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে

সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়া ভাল মনে করিলেন না। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য বোধে এবং তাঁহার অবলম্বিত আদর্শ রক্ষার জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা তাঁহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি মনে করিতেন রামমোহন রায় তাঁহাকে সেই ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ব্যাঘাতের আশঙ্কাতেই তিনি কেশবচন্দ্রের দলের হস্ত হইতে কার্য্যভার লইলেন। তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে ও সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ-দাতা রহিলেন।

১৮৬৫ সালের কার্ত্তিক মাসে কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই দুই প্রচারক সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে বহির্গত হন। তদুপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্দ্র যুবকদলের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে আপনাকে নিয়োগ করিলেন। বোধ হয় ১৮৬৪ সালেই স্বীয় বয়স্যগণের পত্নী-দিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য "ব্রাহ্মিকা-সমাজ" নামে এক নারী-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৬৬ সালের জানুয়ারির শেষে যে মাঘোৎসব হইল, তাহাতে কেশবের ব্রাহ্মিকা-সমাজের মহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা সমাজে বেদীর পূর্ব্বপার্শ্বে পরদার আড়ালে মহিলাদিগের বসিবার আসন করিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে পুরুষ-দিগের সহিত বসিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে লইয়া ডাক্তার রবসন নামক খ্রীষ্টীয় পাদরীর ভবনে প্রকাশ্য সান্ধ্য-সমিতিতে গেলেন। সহরে খুব আলোচনা উঠিল।

ইহার পরে কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঐ সালের এপ্রেল বা মে মাসে কেশবচন্দ্র Jesus Christ, Asia and Europe নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাতে যেমন একদিকে অসাধারণ বাগ্মিতা, অপরদিকে তেমনি আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের উদারতা প্রকাশ পাইল।

তাঁহার নাম সুবক্তা ও বঙ্গসমাজের নেতাদিগের শীর্ষস্থানে উঠিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে যীশুখ্রীষ্টের প্রতি যে প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে দুইদিকে দুই প্রকার চর্চ্চা উঠিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কেটেকিষ্ট পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্র ত্বরায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়া বগল বাজাইতে লাগিলেন। অপরদিকে দেশীয় স্বধর্ম্মানুরাগিগণ কেশবচন্দ্রকে ও নবোদিত ব্রাহ্মদলকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত খ্রীষ্টভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকার বলিয়া প্রতীতি হইল। ব্রাহ্মদিগের সেই যে খ্রীষ্টীয়ান অপবাদ উঠিয়াছে, তাহা আজও যায় নাই। যদিও তৎপরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র Great Men নামক আর একটী বক্তৃতা করিয়া নিজের খ্রীষ্টীয়ান অপবাদ কতকটা দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন বটে, তথাপি সে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল না। এ অপবাদের আর একটু কারণ আছে। এই ১৮৬৬ সাল হইতে, চৈতন্যের প্রভাবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ যিশুখ্রীষ্টকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। বড়দিনের দিন যিশুর ধ্যানে দিনযাপন করা, যিশুর নামে সঙ্গীত রচনা করা, উঠিতে বসিতে যিশু কীর্ত্তন করা, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অধিক অনুশীলন করা প্রভৃতি চলিয়াছিল। সুতরাং লোকের ও প্রকার সংস্কার স্বাভাবিক।

এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রচারকগণ তখন উৎসাহের সহিত মফঃস্বলের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল সমাজকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই সালের ১১ই নবেম্বর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের এক সভাতে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাসূচক এক অভিনন্দন পত্র দিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ রাখা হইল।

১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

অনেকে কল্যকার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাদুকাবিহীন পদে কলিকাতা সহরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রাহ্মবিবাহের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

এই সাল হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের ভবনে তাঁহার বয়স্যদিগকে লইয়া দৈনিক উপাসনা আরম্ভ হইল। এই দৈনিক উপাসনা হইতে নবব্যাকুলতা ও নবভক্তির সঞ্চার হইল। তাহার ফলস্বরূপ ইঁহারা মহাত্মা চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং আপনাদের মধ্যে খোল করতাল সহ সংকীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। অমনি সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মেরা নেড়া-নেড়ীর দল হইল বলিয়া চর্চ্চা উঠিল।

১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। তদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্ত্তন করিয়া ভিত্তিস্থাপন করিতে গেলেন। এই ব্রাহ্মদিগের প্রথম নগর-কীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তনের মধ্যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ জগতের নিকট এই ঘোষণা করিলেন;—

"নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

ইহাই অদ্যাপি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মূলমন্ত্রস্বরূপ রহিয়াছে।

এই ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। নবভক্তির আবির্ভাবে ব্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া, পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন। তাহা ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কেশবচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গের সহরে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই ঐ ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রধানরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে তাঁহার দলের দুইজন প্রচারক ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নরপূজার আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশ্য পত্রে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন।

অল্পদিনের মধ্যে এই আন্দোলন নিরস্ত হইলে, ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

১৮৭০ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন; এবং প্রায় ছয় সাত মাস কাল

সেখানে বাস করিয়া নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে সামান্য ধর্ম্মাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত হন; এবং "ভারত সংস্কার সভা" নামে, একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে সুলভ-সাহিত্য, নৈশবিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্যের সূত্রপাত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সভা, ও ইহার অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্য উঠিয়া গিয়াছে। এখন এলবার্ট কলেজ ভিন্ন অন্য কোনও স্মৃতি-চিহ্ন নাই।

১৮৭১ সালে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আন্দোলন প্রবলরূপে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মদিগের নামে বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, আদি-সমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, ব্রাহ্মবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়া, ১৮৭২ সালের তিন আইন নাম দিয়া একটী সিভিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। তদবধি তদনুসারেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিবাহাদি হইয়া আসিতেছে।

এই সময়েই কেশবচন্দ্র কতকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া, দৈনিক উপাসনা, পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম প্রভৃতির নিয়ম শিক্ষা দিয়া, ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে "ভারতাশ্রম" নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রচারকদিগের অনেকে এবং অপর ব্রাহ্ম-দিগেরও কেহ কেহ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র প্রতিদিন উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিতেন; এবং সকলে নিজ নিজ ব্যয় দিয়া, একত্র আহারাদি করিয়া, এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন।

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের জন্য একটী বিদ্যালয় ছিল। সেখানে আমরা কয়েকজন শিক্ষকতা করিতাম; এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিরের ব্রাহ্মদিগের পত্নী, ভগিনী ও কন্যাগণ পাঠ করিতেন।

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। এ আন্দোলন কালে থামিল বটে, কিন্তু ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল উঠিল। আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী কোনও ব্রাহ্মের বিবাদ উপস্থিত হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাহিরের সংবাদ পত্রে বাহির হইয়া, তাহা হইতে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উঠিল। কেশবচন্দ্র স্বয়ং বাদী হইয়া ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদিগণ ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মোকদ্দমা

উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যে উপাসকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল এবং কেশবচন্দ্রের অবলম্বিত কতকগুলি মত লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিল। এই বিরোধিদল "সমদর্শী" নামে এক মাসিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ওদিকে কেশবচন্দ্র তাঁহার অনুগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিশেষ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং কলিকাতার অনতিদূরে একটী উদ্যান-বাটিকা ক্রয় করিয়া, তাহার "সাধন-কানন' নাম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া প্রচারকদলের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিজে স্বপাকে আহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অনুকরণে তাঁহার প্রচারকগণের অনেকেও স্বপাকে আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ও বাদানুবাদ আরম্ভ হয়।

১৮৭৭ সালের প্রারম্ভে সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের উদ্দেশে "সমদর্শী" দল একটী ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা গঠনের জন্য ব্যগ্র হন। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের চেষ্টাতে বাধা দেন নাই; বরং সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচবিহারের বিবাহ আসিয়া পড়িল; এবং ঐ বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কতকগুলি নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়।

বিবাহান্তে কেশববাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। কেশববাবু তাহা হইতে দিলেন না; সুতরাং ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া, তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন।

ফলতঃ, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে তিনি ভগ্নগৃহের পুনর্গঠনের জন্য যেরূপ গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন তৎপূর্ব্বে বিশ বৎসরে তাহা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সেই শ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। ১৮৮৩ হইতেই দারুণ বহুমূত্র রোগ ধরা পড়িল; এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসের প্রাতে প্রাণবায়ু তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

দীনবন্ধু মিত্র।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে কেবল মাত্র গুপ্ত কবি কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত মিত্রাক্ষর নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা নহে; "নাটুকে" রামনারায়ণের অবলম্বিত নাট্যকাব্যের রীতি হইতেও বঙ্গীয় নাট্য-কাব্যকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহার প্রণীত শর্ম্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাব্যের নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া যায়। এই নূতন পথে অগ্রসর হইয়া অনেকে নাটক রচনা করিবার জন্য প্রয়াসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত নাটক সকল সে সময়ে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রচুর সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রদিগের মধ্যে ইনিও একজন। যে সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালি জাতির নব শক্তি ও নব আকাঙ্ক্ষার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও "বঙ্গদর্শন" আমাদের চিন্তার এতটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়া সেই উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য এ কালের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাঁহারও জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতে অগ্রসর হইতেছি।

দীনবন্ধু বাঙ্গালা ১২৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। কালাচাঁদ মিত্র সামান্য বিষয় কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন; সুতরাং তিনি বাল্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্য-রূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়া অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত

(২৭৮ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

করিয়া দেন। ঐ কর্ম্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ আয়ের অনেক সাহায্য হইত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না। তাঁহার মন অধিক জ্ঞান লাভের জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা আপনাকে অসুখী বোধ করিত।

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কর্ম্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু না বলিয়া গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন; এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া অপরের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশেই তাঁহাকে স্বীয় অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না।

দীনবন্ধুর কলিকাতায় আসা ও বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা বিষয়ে একটী কৌতুকজনক ঘটনা আছে। শৈশবে তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "গন্ধর্ব্ব নারায়ণ"; লোকের মুখে এই নাম দাঁড়াইল "গন্ধ", সমবয়স্ক বালকদিগের মুখে হইয়া পড়িল "থু থু গন্ধ, গন্ধ"! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটী বালকের অশান্তির একটা কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও তাঁহার জননী বিদ্রূপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "তোরা একদিন দেখবি ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে" তথাপি সমবয়স্কদিগের বিদ্রূপে শিশু গন্ধর্ব্ব নারায়ণ নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। যাঁহার দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় হইতে 'নীলদর্পণ' বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন এটা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। যাহা হউক তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এরূপ আগ্রহের সহিত আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংসা ও নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াই গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি "মানব-চরিত্র" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তাঁহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীন্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। প্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্কিমের ন্যায় পদ্য রচনা

পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপায়রূপে অবলম্বন করেন।

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক বিভাগে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এতৎ সূত্রে তিনি উড়িষ্যা, নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড়, প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি রাজকার্য্য বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই প্রধান প্রধান কাজের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধ বাধিলে, ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সমুচিত রূপে নির্ব্বাহ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ মানব-চরিত্র দর্শন, ও এরূপ বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় নাই। তাঁহার রচিত নাটক সকলে আমরা এই সকলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাগণের সহিত নীল-করদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগের ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বে নিজে অনেক নীল-প্রপীড়িত স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের দুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ওজস্বিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের পরীক্ষিত ছিল। সুতরাং প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয় যে আগুন তখন জ্বলিয়াছিল, তাহা তাঁহারও হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি "নীল-দর্পণ" লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬০ সালের শেষভাগে ঢাকা হইতে নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীদের অনুমতিক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, এবং রেভারেণ্ড জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে মুদ্রিত করেন। তাহা লইয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার টাকা জরিমানা ও

একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ঐ এক হাজার টাকা জরিমানা নিজে প্রদান করেন।

প্রতিহিংসোদ্যত নীলকরগণ তখন দীনবন্ধুকে ধরিতে না পারিয়া লংকে কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সারা করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর হইলেন। "নবীন তপস্বিনী," "বিয়ে পাগলা বুড়ো," "সধবার একাদশী," "লীলাবতী," "জামাইবারিক" প্রভৃতি অদ্ভুত হাস্য-রসাত্মক নাটক সকল পরে পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

শেষদশায় তিনি "সুরধুনী-কাব্য" ও "দ্বাদশ কবিতা" নামে দুইখানি পদ্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিস্ফোটকে তাঁহাকে শয্যাস্থ করে। সেই রোগেই ১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসে গতাসু হন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ান, তখন তাঁহার শেষ গ্রন্থ, "কমলে কামিনী" নাটক যন্ত্রস্থ। এই তাঁর শেষ সাহিত্য রচনা। তিনি সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার চিরদিনের বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কার্য্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমন কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই।"

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে তিনি যত স্থানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে অনেক কাল বাস করেন। এখানে তিনি স্থায়ীরূপে থাকিবার মানসে একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী কাব্য" হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল-হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,

রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিণীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।

"একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিণীত মন।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে! সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটী প্রধান এই যে "তিনিই সাধু যাঁর সঙ্গে বসিলে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায়, ও সাধু ভাব সকল জাগিয়া উঠে"। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অনুভব করিতে হয়, যেরূপ মানুষটী গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ হইয়া ফিরিতেছি। দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের এরূপ সাধুতা ছিল, যে তাঁহার সহবাসে একদিন যাপন করিয়া আসিলে দশ-দিন হৃদয় মনের উন্নত অবস্থা থাকিত। এটী স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটীর সন্নিহিত কাঁঠালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কালেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যজগতে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয় কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে "প্রভাকরে"

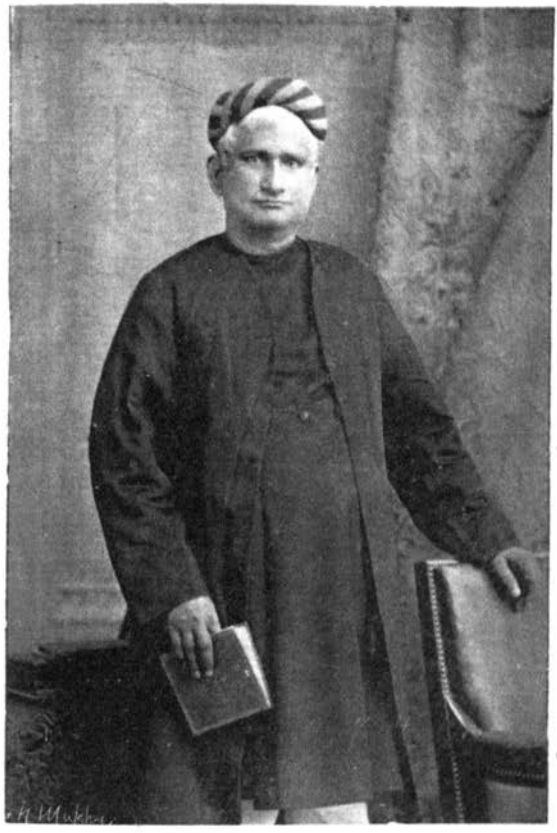

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

(২৮২ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

লিখিয়া কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তখন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাক্‌যুদ্ধ "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রথিত হইয়াছে। এরূপ শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে "ললিতা-মানস" নামে একখানি পদ্য-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে গমন করেন; এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি, এ, উপাধি সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত "দুর্গেশ-নন্দিনী" নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গ-সমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে "বিজয় বসন্ত" "কামিনী কুমার" প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, "হংসরূপী রাজপুত্র", "চক্‌মকির বাক্স" প্রভৃতি কয়েকটী ছোট গল্প, এবং "আরব্য উপন্যাস" প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। "আলালের ঘরের দুলাল" তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

অল্পদিন পরে "কপালকুণ্ডলা" দেখা দিল। যে তুলিকা দুর্গেশ-নন্দিনীর নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুণ্ডলার গাম্ভীর্য্য-রস-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল! লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আরও অনেক-গুলি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকদিগের শীর্ষ-স্থানে স্থাপন করিল।

বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি

অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপর-দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে, কেহই "শবপোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শব পোড়া মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চানা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিস, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিত্তা-কর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি রুসোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল, ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং ক্রমে তিরোভাব হইল।

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও চিত্রণশক্তির সেই পূর্ব্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাঁহার দৃষ্টি ও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল।

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত "সাম্য" নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার শেষ প্রচারিত এই নবধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

এদিকে তিনি গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রসাদের চিহ্ন স্বরূপ "রায় বাহাদুর" ও সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না; কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ঘরে পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম পরিত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

এইকালের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক রচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল বৈশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায় রত্ন মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন।

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন পাঠ করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে

আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারম্ভে তাঁহার পিতা তাঁহাকে টোল চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়া সংস্কৃত কালেজে যাপন করেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের উন্নতি হইয়া ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। ইহার পর তিনি ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র রোগে ধরে। শ্রম করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারিতেন না; বসিয়া থাকাকে ঘৃণা করিতেন; সুতরাং খাটিতে খাটিতে শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তদবস্থাতে ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় মধ্য প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। সেই খানেই ঐ সালের ২২ আগষ্ট তাঁহার দেহান্ত হইল।

সোমপ্রকাশই ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি; সোমপ্রকাশই ইঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে; সুতরাং সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতেছি।

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বীয় পুত্র দ্বারকানাথকে সহায় করিয়া একটী মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন; এবং অল্প কালের মধ্যেই গতাসু হন। ঐ যন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম। যাহা হউক এই দুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীন্তন বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে; এবং দ্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে পরিচিত হয়। তৎপরে তাঁহার রচিত বালক-পাঠ্য "নীতিসার," প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভা সে সমুদয়কে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদা প্রসাদ নামে তাঁহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজ যোগান, তাঁহার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বারকানাথ সম্পাদকতা ভার ও তাঁহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন। কার্য্য-কালে সারদা প্রসাদ আসিলেন না; অপরাপর লেখকগণও অদর্শন হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া গেল। তিনি অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোম-প্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে অধ্যাপকতা কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশীও বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। রাত্রি ১১ টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি ৪ টার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়া ছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পঁক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০৲ দশ টাকা,

এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটী টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।

পরে ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলার রেলওয়ে খোলে। মাতলা বা পোর্ট ক্যানিং একটা প্রধান বন্দর হইবে গবর্ণমেণ্টের মনে এই আশা ছিল। গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা দুঃসাধ্য হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল, এবং পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানি করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। শেষে মাতলাকে অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করা হইল। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে খোলাই সার হইল।

মাতলা রেলওয়ে খুলিলেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাঁহার বাস-গ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে লইয়া যান, এবং সেখান হইতে উহা প্রকাশ করিতে থাকেন। সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একটা প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে, অনেক অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, দেশে গিয়াই বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ বাস-গ্রামের নানাপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে একটী উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন। ঐ স্কুলটী তিনি নিজের ব্যয়ে ও নিজের চেষ্টাতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক বৎসরে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তাঁহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ হইতে বেতনটী পাইয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া সে বেতনের অধিকাংশ তথাকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দিয়া সামান্য অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

পাপের প্রতি তাঁহার এমনি ঘৃণা ছিল যে গ্রামের পাপাচারী লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁপিত। একবার একজন দুশ্চরিত্র পুরুষ একটী গোপ-জাতীয়া বিধবাকে বিপথে লইয়া গেল; এবং কিছুদিন পরে তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতে তাড়াইয়া দিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে সেই রমণীর দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত করাইয়া সেই দুশ্চরিত্র পুরুষের নিকট হইতে ঐ নারীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ লিখিতেছেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে ঐ ধনী লোকটী সদলে সেই বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে সেই ধনীর গ্রীবা ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি সংভ্রম বশতঃ তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে গ্রামে তিনি দুর্ব্বলের রক্ষক ও সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-দাতা রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

বার্দ্ধক্যে একটী বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের শাসন ও ধর্ম্মের উপদেশ রহিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন। তাঁহার একটী পুত্র এই সময়ে জপ, তপ, পূজা প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমন কি সেজন্য তার জ্ঞান চর্চ্চা, সংসারের কাজ কর্ম্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন—'ও শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত, ও যাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিকে মতি না দিয়া ধর্ম্মসাধনে মাতিয়া আছে তাহা ভাল।' সাধারণ মানুষের ধর্ম্মোপদেশের সুবিধার জন্য তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে কাশীতে গিয়া বাস করেন। তীর্থস্থানের দুরবস্থা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

কাশীতে গিয়া কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাণ্ডাগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই ভাব ব্যক্ত করিয়া "বিশ্বেশ্বর-বিলাপ" নামে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা করেন। তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য্য করিতে পারিতেন না।

ইহার উপরে ভার্নেকিউলার প্রেস আক্‌ট্ (Vernacular Press Act) নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। এই সময়ে বঙ্গের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে নিজ ভবনে ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ তুলিয়া না দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে ঐ গর্হিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে কিন্তু পূর্ব্বপ্রভা আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার পরে তিনি "কল্পদ্রুম" নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন; তাহাও তাঁহার অসুস্থতা বশতঃ অধিক কাল রহিল না। চরমে তিনি পীড়িত হইয়া রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে গতাসু হন।

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্য; কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুভক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে সেই অল্প-দিনের সম্বন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। চিরদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম স্মৃতিতে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বসম্পর্কীয় লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি, শ্রদ্ধা প্রচুর পরিমাণে ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিবামাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র বলিয়া প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে লইয়াছিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালিগণের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে

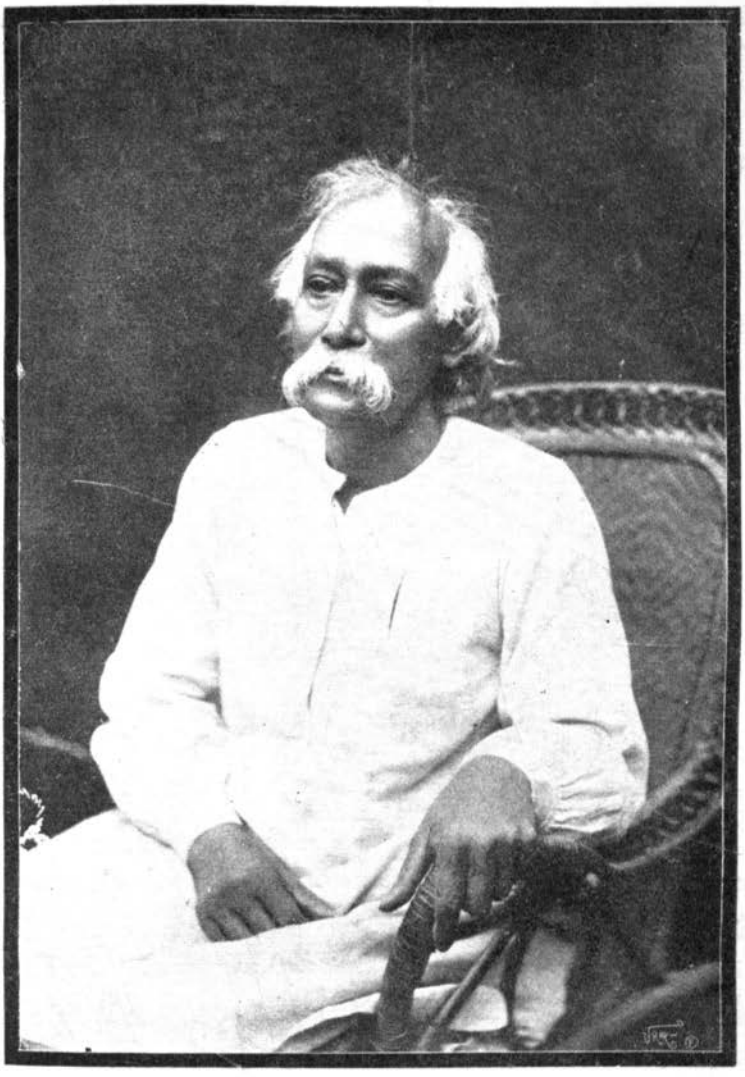

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সি, আই, ই,

(২৯০ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়াছেন; এরূপ জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া এ জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার নাম নব্য-বঙ্গের শিক্ষাগুরুদিগের মধ্যে গণনীয়; সুতরাং আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

কলিকাতার অদূরবর্ত্তী হাবড়া বিভাগের পাইকপাড়া নামক গ্রামে, ১৮৩৩ সালের ২রা নবেম্বর দিবসে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটী পুত্র কোলে ইঁহাকে লইয়া কলিকাতা নেবুতলাতে ইঁহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই ৩২ বৎসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন ইঁহার মাতুলদ্বয়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের উপরে ইঁহার রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার পড়ে। এই পারিবারিক দুর্ঘটনার চারি বৎসর পরেই তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি উক্ত মাতুলদ্বয়ের স্নেহ যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

তাঁহার মাতুলেরা প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবার জন্য তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেন; এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্য ঠাকুর দাস দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। উত্তর কালে এই ঠাকুর দাস দে যতদিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন; এবং নিজ কার্য্যের সহায়রূপে রাখিয়াছেন।

সরকার মহাশয়ের মাতুলদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল ট্রাভ্‌লিং প্রিণ্টারের কাজ করিতেন; তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় না।

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল তাঁহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন। তাহার দেড় বৎসর পরে ১৮৪২ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পর্য্যন্ত হেয়ারের স্কুলে ছিলেন। ঐ সালে তিনি জুনিয়ার স্কলার্সিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু কালেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইল, তিনি নানা

জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। কালেজের পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থ সকলে তাঁর পরিতৃপ্তি হইত না। বিজ্ঞান পাঠের জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইত। তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না; তদনুরূপ আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইবার সংকল্প করিলেন; এবং তাঁহার হিন্দু কালেজের অধ্যাপকদিগের অমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন।

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন; এবং ১৮৬০ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৮৫৯। ৬০ সালে এল্, এম্, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। মেডিকেল কালেজে অধ্যয়নকালে, তিনি তাঁহার অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এবং সে সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য যতগুলি পারিতোষিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অর্জ্জন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল; এবং তাঁহার বহুদর্শিতা ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরকালের মধ্যে সহরের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন।

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্ব্বোচ্চ এম, ডি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার মান সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় এম, ডি বলিয়া তাঁহার নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল।

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে সহরে একটী নূতন সভা স্থাপিত হয়। তাহা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএশন নামক সভার বঙ্গীয় শাখা। কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার সরকার একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিযুক্ত সেক্রেটারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত সভার একজন সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হন।

যে কারণে ঐ সভার প্রতিষ্ঠাকার্য্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই;—ঐ দিনের বক্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপেথিক

চিকিৎসা প্রণালীর দোষ কীর্ত্তন করেন। সেই বাক্যগুলি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাক্তার সরকারের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্রই রাজাবাবু ঐ উক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই বিচার বহুদিন চলিতে থাকে। ক্রমে আর এক ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। একজন বন্ধু (Morgan) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত Philosophy of Homeopathy নামক একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিবার জন্য ডাক্তার সরকারকে অনুরোধ করেন। ঐ সমালোচনা 'Indian Field' নামক কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার কথা থাকে। কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনা মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে কার্য্যতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখিয়া মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল দেখিবার জন্য রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎসা বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয়; এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুলির চিকিৎসা কার্য্য দেখিতে দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হানিমানের অবলম্বিত প্রণালী যে যুক্তি-সঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে তাঁহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন।

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জ্জন ও সুখ সচ্ছন্দের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতি লাভ, বা লোকের অনুরাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তাঁহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল তখন তিনি তাহা তাঁহার চিকিৎসকবন্ধুগণের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএশনের বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার সরকার "চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দ্দিষ্টতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সত্য-প্রিয়তা, নির্ভীক-চিত্ততা সমুদয় একাধারে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি এলোপেথিক চিকিৎসা-প্রণালীর সর্ব্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্ত্তন করিয়া হানিমানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ডাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়া লাল হইয়া গেলেন; ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন "ডাক্তার সরকার! ডাক্তার সরকার! আর একটা কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হ'তে বাহির করে দেব।" পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন, যে ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী সভাপতি থাকা দূরে থাক্, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন না। ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ঐরূপ মতে সায় দিলেন। সভামধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন 'আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব তাতে আর কি? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই হবে"। ওদিকে সংবাদ পত্রের স্তম্ভ সকল এই বার্ত্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন তাঁহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক বাক্যে তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটী হইয়া গেল। ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটীও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। পর বৎসরেই তাঁহার Calcutta Journal of Medicine বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই; যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে

তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন; —"I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth—অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম।" তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসারদিগের অনেকে তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অবাচ্য কুবাচ্য বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কি ভাবে সে সমুদয় কটূক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ ১৮৬৭ সালে মার্চ্চ মাসে মুদ্রিত তাঁহার ঐ বক্তৃতার ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন;—

Whatever may now have become the differences between my venerable Preceptors of the Medical College and myself, I shall always look back with ecstacy and gratitude on those days when I used to be charmed by their eloquence, pregnant with the words of Science.

আবার ঐ ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন :—

Persecution has already commenced. Professional combination is strong against me, and is likely to be stronger; every one's arm seems to be raised against me; but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been, and shall be raised against none. It is probable "my bread will be affected," but I shall never forget the words of Jesus, who certainly speaks as man never spake, that as beings, instinct with Reason, and made in the image of our Creator, "we must not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."

সকলে অনুভব করুন যখন তাঁহার বিরোধিগণ কোলাহল করিতেছিলেন এবং তাঁহার প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই মহামনা ব্যক্তি কোন জগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে আমি তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচয় পাই, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত বলিয়া লিখিয়া রাখিতেছি।

আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল এ পরীক্ষা দিয়া উঠিয়াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেছিলেন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুতা সূত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে আনিয়া, দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন তাহা নহে, ভ্রাতৃ-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই ভবনের স্থায়ী-চিকিৎসক ছিলেন। এল, এ পরীক্ষা কালে গুরুতর শ্রম করাতে আমার একপ্রকার পীড়া জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন আমাদের বাসাতে এই একটা বামনের ছেলে আছে, এল এ পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম ক'রে এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়া করে এর চিকিৎসার ভার নিতে হবে।" ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার ভার লইলেন। বলিলেন ;—"তোমার পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে পাঠিও।" কিন্তু সে দিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল তাঁহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু তাঁহার একটা স্বভাব এই ছিল যে তিনি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিৎসু হইতেন। সে দিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মশাই কি ঔষধ দিলেন?" ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মেডিকেল কালেজে পড়েছেন?"

গিরিশ বাবু—না।

ডাক্তার সরকার—তবে এমন আহাম্মুকি করেন কেন? আমি কি ঔষধ দিচ্চি তাতে আপনার দরকার কি?

এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে আমাদের সকলের প্রাণে বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণটী ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাঙ্গালাতে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহা তাঁহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্ব্বোক্ত কর্কশ ব্যবহারের জন্য তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না যে নিজে ত গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে যাইতেছি, তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার। চিঠীখানি পাঠাইয়াই চিন্তা হইল

বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আসিবার কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাসা করিলেন "শিবনাথ ভট্টাচার্য্য তোমাদের বাড়ীতে কে?" তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন "সেই যে মশাই পাগলা ছেলেটা"। শুনিলাম ডাক্তার সরকার গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেল; "ওরে আয় আয় ডাক্তার সরকার তোকে ডাকচেন।" আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন—"তোমার ইংরাজী ষ্টেটমেণ্ট দেখে খুসি হয়েছি; আর তোমার বাঙ্গালা পত্রের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।" আমি ত অবাক্, তারপর তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলিয়া তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরূপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় নাই, এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি কলেজের একটা গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। আমার তিরস্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পরিচয় পাইলাম। সেই তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। তদবধি আমার বা আমার পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সংবাদ দিবামাত্র বুক দিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন; এবং বিনাভিজিটে দিনের পর দিন আসিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। সে উপকারের ঋণ আমার অপরিশোধনীয় রহিয়াছে।

এরূপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? অচিরকালের মধ্যে তাঁহার পসার আবার ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপেথিও লোকচক্ষে উঠিয়া পড়িল।

১৮৭০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে তাঁহাকে আর্ট-ফ্যাকল্‌টীর প্রতিনিধি করিয়া সিণ্ডিকেটে লওয়া হয়। তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সভ্যগণ তাঁহাকে ফ্যাকল্‌টী অব মেডিসিনের প্রতিনিধিরূপে সিণ্ডিকেটে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ফ্যাকল্‌টী

অব মেডিসিনের সভ্যগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাকল্‌টীর ডাক্তারগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন, সেই পুরাতন বিবাদ। ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইখানি পত্র লিখিতে হয়; তাহাতে সেনেটের সভ্যগণের মনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হয়; এবং তাঁহারা তাঁহাকে ফ্যাকল্‌টী অব মেডিসিনে বাহাল রাখেন।

১৮৭৬ সালে তাঁহার প্রধান উদ্যোগে ও তাঁহারি চেষ্টায় 'সাএন্স এসোসিএশন' প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অনারারি মাজিষ্ট্রেটরূপে বৃত হন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববৎসর পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য দক্ষতার সহিত করিয়া আসেন।

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মান সম্ভ্রমের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন।

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। ১৮৯৩ সালে চতুর্থ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি ঐ পদ নিজে পরিত্যাগ করেন।

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে বৃত হন।

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের জন্য ফ্যাকল্‌টী অব আর্টের সভাপতির কার্য্য করেন।

বহুবৎসর এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন।

১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডি, এল্‌ উপাধি প্রদান করেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

সায়েন্স এসোসিএশন স্থাপন ব্যতীত তিনি আর একটী সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। একবার স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে তিনি বৈদ্যনাথে বাস করিতেছিলেন। তখন তথাকার কুষ্ঠরোগীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার পর-দুঃখ-কাতর হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তিনি নিজে ৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্য একটী আশ্রয়-বাটিকা নির্ম্মাণ করেন; এবং তাঁহার পত্নী 'রাজকুমারীর' নামে তাহা উৎসর্গ করেন। ১৮৯২ সালে সার চার্লস ইলিয়ট তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন।

অবিশ্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে ডাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না; মধ্যে মধ্যে হাঁপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হইয়া পড়িতেন। তদুপরি চিকিৎসা-সূত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিয়াছিল। তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মূত্রাধারে একপ্রকার পীড়ার সঞ্চার হইয়া বড়ই ক্লেশ দিতে লাগিল। ঐ রোগে ১৯০৪ সালের ২৩এ ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকালে প্রাণবায়ু তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। বঙ্গের একটী উজ্জ্বল তারা চিরদিনের জন্য অস্ত গেল।

আমরা তাঁহাতে যে কেবল সাহস ও সত্যপ্রিয়তাই দেখিয়াছিলাম তাহা নহে। এরূপ জ্ঞানানুরাগী মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। চিকিৎসাবিদ্যা ও বিজ্ঞান তাঁহার নিজের স্বোপার্জ্জিত বিশেষ বিদ্যা ছিল; কিন্তু তাহাতে তিনি তৃপ্ত হন নাই; তাঁহার জ্ঞানানুরাগ সর্ব্বতোমুখীন ছিল। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাঁহার চিত্তের অভিনিবেশ দৃষ্ট হইত। সদ্‌গ্রন্থ সকল ক্রয় করা ও রক্ষা করা, তাঁর একটা বাতিকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা তাঁহার লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে যাইতাম। তিনি তাঁহার জ্ঞানসম্পত্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন। তাঁহার ভবনে জ্ঞানানুরাগী বন্ধুগণের একটা আড্ডা ছিল। সেখানে বসিলেই অনেক জ্ঞানের কথা শোনা যাইত। অনুমান করি তিনি যে লাইব্রেরি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে। ধনী ব্যক্তিরা বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যায়, এই স্বাবলম্বনশীল, আত্মোন্নতিপরায়ণ দরিদ্রের সন্তান স্বোপার্জ্জিত ধনের চিহ্ন স্বরূপ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের জ্ঞানসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বহুদিন সাধুমুখে শুনিয়া আসিতেছি, যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর আবির্ভূত থাকেন। মহেন্দ্রলাল জীবনের সকল পথে, সকল সঙ্কটে, সকল সংগ্রামের মধ্যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতেন। যিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রোগযন্ত্রণার মধ্যে নিম্নলিখিত সংগীত রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের বিষয় আর কি বলিব।

পাহাড়ী—কাওয়ালি।

সয় না রোগের যাতনা আর সয়না,
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণা।

কৃপাদৃষ্টি থাকলে তোমার, থাকেনা ত (কোন)
যাতনা।
দিয়ে এ বিশ্বাস, করো না নিরাশ, (একবার)
স্নেহ-নয়নে চাও না।
কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আর বাঁচিবনা, বাঁচিবনা।
সকলি খাদ, অধিক পোড়ালে কিছুই থাকবে না।
জানি প্রভু, যা কর তুমি, তা সবে হয় মঙ্গল সাধনা,
তবু কাতর হয়ে আমি করিয়াছি যে প্রার্থনা;
তাতে তব কাছে, যদি হয়ে থাকি অপরাধী
নিজগুণে দয়াময় করহে মার্জ্জনা।
কারে দুঃখ জানাই, প্রভু, তোমা বিনা,
তুমি ছাড়া কে আছে, বুঝিতে মনের বেদনা,
কে অছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাই না;
তাই কেঁদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জ্বালা যন্ত্রণা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূচনা।

১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত।

১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। 'ভারত-সংস্কার' সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে পাঁচ প্রকার কার্য্যের আয়োজন করিলেন। (১ম) সুলভ সাহিত্য, (২য়) সুরাপান নিবারণ, (৩য়) শ্রমজীবি-বিদ্যালয়, (৪র্থ) স্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ। সুলভ-সাহিত্য বিভাগে 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইল; সুরাপান নিবারণ বিভাগে "মদ না গরল" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; শ্রমজীবি-বিদ্যালয় বিভাগে শ্রমজীবিদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত এবং তাহার কার্য্যভার তাঁহার অনুগত কার্য্যদক্ষ এক প্রচারকের

প্রতি অর্পিত হইল; স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য এক বিদ্যালয় খোলা হইল; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বয়স্থা মহিলাগণ পাঠ করিতে লাগিলেন; এবং আমরা কয়েকজন তাহার শিক্ষক হইলাম; দাতব্য বিভাগে এক মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন বেহালা প্রভৃতি কলিকাতার উপনগরবর্ত্তী স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার একজন অনুগত প্রচারক সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন গিয়া ম্যালেরিয়া-পীড়িত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা ও তাহাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারক খ্যাতনামা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশের সন্তান। যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন; এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়াই স্নান ও ঈশ্বরোপাসনা সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ পূর্ব্বক, ঔষধ ও পথ্যাদি লইয়া, বেহালাতে গমন করিতেন; এবং সেখানে ১০।১১ টা পর্য্যন্ত রোগী দেখিয়া এবং ঔষধ বিতরণ করিয়া ১২টার সময় সহরে ফিরিতেন; ফিরিয়া আহার করিয়াই বয়স্থাবিদ্যালয়ে গিয়া পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সে সময়ে তাঁহার যে পরিশ্রম দেখিয়াছি গবর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারীকে তত পরিশ্রম করিতে কখন দেখি নাই। সেই শ্রমে তাঁর শরীর জন্মের মত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি পরে এক প্রকার ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়; কিন্তু আমাদের সঙ্গে বাসকালে যে নিঃস্বার্থ পরসেবা, যে সদনুষ্ঠানে একাগ্রমতি, যে ধর্ম্মোৎসাহ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন আমাদের আদর্শস্বরূপ স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে 'সুলভ সমাচার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলভ সমাচার, এদেশে সুলভ সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শন করিল। এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে, এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে পারে, তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। "সুলভ" যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে আলোচনা পড়িয়া গেল। 'সুলভ' একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত সংবাদ দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা লোকচিত্তের সদ্ভাব উদ্দীপন ও হাস্যরসোদ্দীপক গল্পাদি দ্বারা আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় 'সুলভ' কয়েক বৎসর পরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এই পাঁচ প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আরও কয়েক প্রকার কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। হরনাথ বসু নামক ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্যের প্রতিষ্ঠিত একটী স্কুল নিজ-হাতে লইয়া তাহার এলবার্ট স্কুল নাম দিয়া চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে কলেজ স্কোয়ারের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যবহৃত একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন; এবং তাহার উপরের তালার বড় হলটী ট্রষ্টিগণের হস্তে দিয়া, এলবার্ট হল নাম দিয়া, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুষ্ঠিত আর একটী প্রধান কার্য্য ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড বাসকালে ইংরাজজাতির গার্হস্থ্যনীতি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন ইংরাজের home বা গৃহ-পরিবারের ন্যায় জিনিসটী আর পৃথিবীতে নাই। বাস্তবিক ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের গৃহের ধর্ম্মভাব, সুশৃঙ্খলা, সুনিয়ম, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, কার্য্যবিভাগ, নরনারীর স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয় এবং অনুকরণের যোগ্য। তিনি মনে করিলেন একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্ম-পরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন; এবং তাহাদিগকে কিছুকাল সুনিয়মে ও ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রাখিয়া পারিবারিক ধর্ম্ম-জীবনে শিক্ষিত করিবেন। তৎপরে তাহারা সেই শিক্ষার ভাব লইয়া নানা স্থানে যাইবে; ক্রমে ব্রাহ্মপরিবার সকল ধর্ম্মসাধন, শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম বিষয়ে আদর্শ পরিবার হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল। তাঁহার আহ্বানে আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত-আশ্রমে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। সেখানে একত্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদ্দ্বারা আমরা আপনাদিগকে বিশেষ উপকৃত বোধ করি। দুঃখের বিষয় আশ্রমটী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই; কয়েক বৎসর পরেই উঠিয়া যায়।

আর এক কারণে এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কালটী বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ও তদ্দ্বারা বঙ্গসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চ্চা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ভিতরে অনেকদিন হইতে ঐ চর্চ্চা চলিতেছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন

দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, একাগ্রচিত্ত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন করেন। তাঁহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আসিবার সময় তাঁহার প্রকাশিত "অবলাবান্ধব" নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিয়া আসেন। "অবলাবান্ধব" ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়; এবং নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে অত্যগ্রসর দলের কাগজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কলিকাতাতে আসিয়া নূতন নূতন লেখকদিগের সাহায্যে অবলাবান্ধবের শক্তি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাহ্ম যুবকযুবতীদিগের মধ্যে অনেকে ঐ ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাস মহাশয় ১৮৭০ সালে হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ব্রাহ্মদিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির তাহাতে কেন মহিলাদিগের জন্য পর্দ্দার বাহিরে বসিবার স্থান থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদলের মধ্যে এই আলোচনা কিছুদিন চলিল। অবশেষে তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়া পর্দ্দার বাহিরে প্রকাশ্যভাবে বসিতে ইচ্ছুক, এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর কতকগুলি লোক যেমন এই প্রার্থনা জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন অনেক সভ্য তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চর্চ্চা যখন চলিতেছে এমন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণকে লইয়া আসিয়া পর্দ্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধ্যে বসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ নিষেধ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন—তাঁহারাও উপাসকমণ্ডলীর সভ্য, মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহারাও সাহায্য করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা তাঁহাদের বসিবার অধিকার আছে।" কিন্তু সে আপত্তি শোনা হইল না। ধারান্তরে তাঁহারা মহিলাগণের সহিত উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল। তখন তাঁহারা বিরক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন; এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ

থাস্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপরে অন্য স্থানে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সমাজের কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল; ভৎপরে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে পর্দ্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য বসিবার আসন করিয়া দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার ব্রহ্মমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বতন্ত্র সমাজটী উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন দুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নারী-কুলের শিক্ষার যে আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাহা অগ্রসর দলের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের কন্যাদিগকে সে বিদ্যালয়ে দিলেন না। প্রধানতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে "হিন্দুমহিলা-বিদ্যালয়" নামে একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেখানে গাঙ্গুলি মহাশয় শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বিবাদ ক্ষেত্রে অনুমান ১৮৭২ সালের শেষে একজন শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড। ইনি পরে বরিশালের মাজিষ্ট্রেট বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গার্টন কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় নারী-কুলের মধ্যে সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার দুরবস্থার কথা শুনিয়া, এদেশে আসিয়া, নারীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাহায্য করিবার বাসনা তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি আসিয়া পূর্ব্ব আলাপসূত্রে সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন; এবং নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। ওদিকে আনন্দমোহন বসু মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কুমারী এক্রয়েড পরিণীতা হইয়া সহর পরিত্যাগ করাতে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় রূপান্তরিত হইয়া "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" নাম ধারণ করিল; এবং প্রধানতঃ আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে চলিতে লাগিল। ইহাই বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষার প্রথম আয়োজন। কয়েক বৎসর পরে এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেথুন কলেজের সহিত সম্মিলিত হয়; এবং আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, মনোমোহন

ঘোষ প্রভৃতি বেথুন স্কুল কমিটীতে স্থান প্রাপ্ত হন; এবং নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্য বেথুন স্কুলে কালেজ বিভাগ খোলা হয়।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আর এক প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেক যুবক সভ্য ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপের মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেন না। তিনি ইহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন; সুতরাং একটা মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। সভাসমিতিতে ও প্রকাশ্য পত্রাদিতে আন্দোলন চলিল। অবশেষে নিয়মতন্ত্র-পক্ষীয়গণ "সমদর্শী" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তদবধি তাঁহাদের নাম 'সমদর্শী' দল হইল। স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষের অনেকে এ দলেও প্রবেশ করিলেন। এই আন্দোলনের চরম ফলে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

কিন্তু যেজন্য এই কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহা অন্যপ্রকার। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া আর একটী কার্য্যে হস্তার্পণ করেন; যেজন্য ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুসমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মনে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি হ্রাস হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের তরঙ্গ উত্থিত হয়। তাহা এই—

ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৬৫ সাল হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক নব বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দু-বিবাহ-প্রণালীর সাকারোপাসনা, ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন আর সকল বিষয়েই উহা প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল।

যতদিন এক জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছিল, ততদিন ঐ সংস্কৃত পদ্ধতির বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ সাল হইতে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রণীত পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনাদের বিশ্বাস ও রুচির অনুরূপ এক নূতন পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। তখন হইতে এই বিচার উপস্থিত হইল ব্রাহ্মসমাজের নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অনুসারে বৈধ কি না? কয়েক বৎসর এই বিচার

চলার পর কেশবচন্দ্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত নির্দ্ধারণের জন্য, আদিসমাজের পদ্ধতি ও নিজেদের অবলম্বিত পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেলের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি উভয় পদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে অবৈধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত উন্নতিশীল দলের ঘোর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজ নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্রানুসারে অবৈধ।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্ম-ম্যারেজ বিল নামে যে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ঐ নাম পরিত্যাগ করিয়া "নেটিব ম্যারেজ বিল" নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের মুখপাত্র হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতির ও দেশের অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাদির প্রতিবন্ধকতায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হইল।

ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটীকে নামহীন রাখিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন দুইটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম, এই নূতন আইনে কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়স কত রাখা হইবে? দ্বিতীয়, এই আইন কাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইতেছে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার সভার সভাপতি-রূপে দেশের নানা প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশের মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত বয়স ষোড়শ বর্ষের উপরে নির্দ্দিষ্ট হইল। কেবল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্যতম প্রোফেসার ডাক্তার চার্লস প্রভৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে চতুর্দ্দশ বর্ষকে সর্ব্ব-নিম্নতম বয়স মনে করা যাইতে পারে। তদনুসারে, ১৮৭২ সালের তিন আইন নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বালিকাদিগের সর্ব্বনিম্ন বিবাহোপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটীর মীমাংসা গবর্ণমেণ্ট এইরূপ করিলেন যে, এই নূতন আইন তাহাদেরই জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, য়িহুদী প্রভৃতি কোনও ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, এবং ঐ সকল ধর্ম্মের

নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। বাহিরের লোকের মনে এই কথা দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মেরা বলিতেছে—"আমরা হিন্দু নই।" আদিসমাজ এই কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলও আপনাদের পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা সামাজিক ভাবে হিন্দু হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্ম উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন একেশ্বর-বাদ; সুতরাং তাহাকে ঠিক হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না।

এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীয় সভার উদ্যোগে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে এক বক্তৃতা দেওয়া হইল। আদিসমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেই বক্তৃতা দিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতাতে সভাপতির কার্য্য করিলেন। অচির কালের মধ্যে ঐ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা এদেশের সর্ব্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বসু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী থেলৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার অধিবেশন হইত। এই সভা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রীয় সাত্বিক আচারের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ভাবের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভ্যর্থনা, প্রভৃতি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই ইহা একটি প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইল। ছি! ছি! ব্রাহ্মগণ আপনা-দিগকে হিন্দু বলিতে চায় না, এই রব যেমন দেশে উঠিয়া গেল, তেমনি এই সভার উদ্যোগে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল।

চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্ব্বের ন্যায় নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না; এবং যুবক দলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই তাঁহার বিরোধী

দল দেখা দিল; তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবক দলের নেতৃত্ব এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া, কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন; স্বপাকে আহার করিতে লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন। 'সমদর্শী' দল এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, যে যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি চলিয়া গেল।

কিন্তু যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন রহিল না। দুই জন প্রতিভাশালী নেতা আসিয়া এই সময়ে বঙ্গের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক দিকে আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিলেন; অপর দিকে সেই সময়েই বা কিঞ্চিৎ পরেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। ইঁহারা উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার যুবক ইঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে লাগিল; এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল। যুবকদল যেন ব্রাহ্মসমাজের দিকে পিঠ ফিরিল, এবং রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরিল। মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজ স্থাপিত হইয়া সেই গতিকে কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত করিয়াছিল; কিন্তু আমার মনে হয়, যুবক দলের সে ভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই।

যখন ছাত্র দল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইল; তাহা ভারতসভার স্থাপন। তাহার ইতিবৃত্ত এই:— বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সম্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাঁদের সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা হইত। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দালনের উপযোগী কোনও সভা নাই। কথা বার্ত্তা হইতে হইতে অবশেষে একটী রাজনৈতিক সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারতসভা স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে সে একটা স্মরণীয় দিন। যত দূর স্মরণ হয়, সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সত্ত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া

ভারত সভা স্থাপনে সহায়তা করিলেন। আমাদের অনেকের সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় ভারত সভাতে যোগ দিলেন; এবং পরে ইহার সহকারী সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দ মোহন বসু ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারত সভা একটী মহৎকাজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করাইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকারী বক্তৃগণ সর্ব্বত্র ভারত সভার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং রাজনীতির চর্চ্চার অভ্যাস যাহাদের ছিল না, সেই চর্চ্চাতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ও যত্নপর ছিলেন।

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহাদয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়া, উন্নতি-শীল ব্রাহ্মগণ দুই ভাগে বিভক্ত হন। প্রতিবাদকারী দল ১৮৭৮ সালের মে মাসে সাধরণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী সভ্যগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে সিটীস্কুল নামে একটী নূতন স্কুল স্থাপিত হয়। উহার অনুষ্ঠান-পত্র আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার নামে বাহির হয়। আনন্দমোহন বাবু তাহার পরামর্শ দাতা, সুরেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারি থাকি। এই সিটীস্কুলের স্থাপন সে সময়কার একটী বিশেষ ঘটনা বলিয়া এসকল বিষয় উল্লেখ করিতেছি। সে সময়ে ইহা সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলের ও তাহাদের অভিভাবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন, যে স্কুল খুলিবা মাত্র প্রথম মাসেই ছাত্র সংখ্যা এত হইল যে ব্যয় বাদে অর্থ উদ্বৃত্ত হইল।

ঐ ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ছাত্রদিগের জন্য ছাত্র-সমাজ নামে একটী সমাজ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটীস্কুলের ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার অধিবেশন হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত শিক্ষা প্রণালী ধর্ম্ম শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা ঐ ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র এই সমাজে যোগ দিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় ও আমি প্রধানতঃ

এই সমাজে উপদেশ দিতাম। ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ সংস্কার, সাধারণ জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ হইত। মধ্যে মধ্যে আমরা ২০০। ৩০০ ছাত্র লইয়া শিবপুরের কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতাম, এবং নানা প্রকার সদালোচনাতে সমস্ত দিন যাপন করিয়া আসিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের মধ্যে কিছু দিনের জন্য নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ছাত্রসমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এক্ষণে এই কালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বে ১৮৬৯ সালের শেষ ভাগে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঢাকাতে গমন করেন। তৎপূর্ব্ব চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীয় বার ঐ সহরে গিয়াছিলেন; এবং একমাস কাল তথায় বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৯ সালের শেষ ভাগে যে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এক স্থানে এই ভাবে দিয়াছেন :—

"স্বনাম-ধন্য কেশবচন্দ্র তাঁহার কতিপয় শিষ্যসহ ঢাকায় আগমন করিলেন; কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিলেন; তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ঢাকায় সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা ঢাকার নগর সঙ্কীর্ত্তনে প্রথম উত্তোলিত হইল। যাহারা কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহারাও নগর সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত, ঋষিবেশে সুশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্ম পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল; এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সম্মান করিতে শিখিল।"

"কিন্তু এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। উহা এখন আর ব্রহ্মোপাসনার মন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে প্রতিভাত হইল না। ব্রাহ্মগণ সমাজ-বদ্ধ হইয়া যথারীতি দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ ত্যাগ, দলাদলি আরম্ভ হইল, দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাহ্মণ যুবা উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, নিশিকান্ত ও তদনুজ শীতলাকান্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই

ধনসম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র। তাঁহারা যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন আরও বহু যুবা তাঁহাদিগের পথ লইল, তখন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।"

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সুপ্রসিদ্ধ কে, জি, গুপ্তের পিতা কালীনারায়ণ গুপ্ত সপুত্রে ও অপরাপর যুবক প্রভৃতি প্রায় ৪০ চল্লিশজন লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক দিকে এই দীক্ষার ফলস্বরূপ প্রাচীন সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে ব্রাহ্ম-সমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণ মহোৎসাহে নানা বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

কেবল তাহা নহে। ১৮৭০ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "শুভসাধিনী" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তাহা লোকের চিত্ত বিনোদন ও শিক্ষা উভয়ের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষজ মহাশয় সমাজ-সংস্কারে উৎসাহদানার্থ "সমাজ-শোধিনী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এ গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

তৎপরে কলিকাতাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইলে, তাহার এক বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বান্ধব" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বান্ধব' বঙ্গ সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতি প্রতিপত্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ব্রাহ্মসমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণের যে কার্য্যতৎপরতার উল্লেখ অগ্রে করিয়াছি, তাহা এই কালের মধ্যে ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। এই সকল কার্য্যে পূর্ব্বোল্লিখিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় যুবক প্রধান সারথিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথম এই সময়ে কিছুদিন "শুভ-সাধিনী" নামে ব্রাহ্মদিগের একটী সভা ছিল। বোধ হয় তাহার সংশ্রবেই কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "শুভসাধিনী" পত্রিকা বাহির করিয়া থাকিবেন। ১৮৭০ সাল হইতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অভয় কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার দাস তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। এই সভার উদ্যোগে "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হইল। নবকান্ত বাবুই তাহার সম্পাদক হইলেন। ইঁহারা অর্থসংগ্রহ

করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পাঠের ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে ইঁহাদের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টও নাকি ১৫০ টাকা সাহায্য দিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে "বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভা" নামে এক সভা স্থাপিত হইল। ঢাকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভার সভাপতি হইলেন। ইহাতেই প্রমাণ যে ওই সভা সকল শ্রেণীর উদার-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে এই সভার সভ্যগণ "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নবকান্ত বাবু ঐ পত্রের সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করেন। এরূপ তাজা তাজা মনের ভাব প্রকাশক, হৃদয় মনের তন্ময়তা-সূচক পত্রিকা আমরা অল্পই পড়িয়াছি! তাহার ফল কোথায় যাইবে! দেখিতে দেখিতে ঢাকার যুবকদলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদলের, মধ্যে মহোৎসাহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিকে ব্রাহ্ম-যুবকগণ জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া, মুসলমানের সহিত আহারাদি করিয়া, সমাজ হইতে বর্জ্জিত হইলেন; এবং ঘোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন; অপর দিকে আশ্রয়গ্রহণার্থিনী কুলীন কন্যাদিগকে ও হিন্দু বিধবাদিগকে আশ্রয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার এক একটী ঘটনা যেন কোনও অদ্ভুত উপন্যাসের এক এক পরিচ্ছেদের ন্যায়! এক একটী বিধবা বা কুলীন কুমারীকে উদ্ধার করিতে গিয়া যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে লাগিলেন। একটী কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাহের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করাতে, একজন যুবক, ঐ কন্যার অভিভাবকগণের প্রেরিত গুণ্ডার লগুড়াঘাতে মাথা ফাটিয়া, মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন। তথাপি তাঁহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না।

আর একটী পলায়িতা ও আশ্রয়ার্থিনী কুলটার কন্যাকে আশ্রয় দেওয়াতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে ইংরাজ বিচারপতির বিচারে ঐ কন্যার আভিভাবকতা ভার তাহার মাতার হস্ত হইতে লইয়া নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাহ্মণ গৃহস্থের সন্তান হইয়াও যখন দারিদ্র্যে পড়িলেন, তখন দরিদ্র ভদ্রসন্তানদিগকে

পথ দেখাইবার জন্য নিজে জুতার দোকান করিয়া জুতা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজের অনেকে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি জ্ঞানে বা পদ-সম্ভ্রমে পূর্ব্ববঙ্গে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না; কিন্তু এই কালের মধ্যে ঢাকাতে যতপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার অধিকাংশের উদ্ভাবনকর্ত্তা। তিনি সকল সদানুষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এখানে দিতেছি। বাঙ্গালা ১২৫২ ইংরাজী ১৮৪৬ সালের ১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ঐ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা জজ আদালতের উকীল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্মসমাজ-বিদ্বেষী মানুষ ছিলেন। ১৮৬৫ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রভাব হইতে যুবকদলকে বাঁচাইবার জন্য যে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন। তিনিই স্বধর্ম্মানুরাগী মানুষদিগকে একত্র করিয়া ঐ নবধর্ম্মকে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু কি বিচিত্র ঘটনা! তাঁহার পুত্রগণই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল! জ্যেষ্ঠ শ্যামাকান্ত ব্যতীত আর তিন পুত্র নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে নবকান্তকেই নির্যাতন ও দারিদ্র্যের তাড়না বিশেষভাবে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার দেখিয়া পিতা কাশীকান্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে বিরত হন নাই। কিন্তু কিছুতেই নবকান্তকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না।

তাঁহার পিতৃবিয়োগের পরে তাঁহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পিতা উইল করিয়া গেলেন যে ছেলে স্বধর্ম্মে না থাকিলে সে তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাইবে না। তদনুসারে নবকান্ত সর্ব্বপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঘোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িলেন। তিনি প্রথমে ধামরাই নামক স্থানের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে শ্রীনগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলেন, যে "স্কুলের সম্পাদক তাঁহাকে স্কুলের বিল সম্বন্ধে একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন"।

ঢাকাতে আসিয়া তিনি প্রথমে পোগোস স্কুলে, তৎপরে জগন্নাথ কালেজে শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়া ৪০ জনকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মধ্যে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় একজন ছিলেন। সে সময়ে ঢাকাতে কিরূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি।

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নানা সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ভবন আশ্রয়ার্থিনী হিন্দু বিধবা ও কুলীন কন্যাগণের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিল। তিনি কৌলীন্যপ্রথা ভঞ্জন, বহু বিবাহ নিবারণ, সুরাপান ও দুর্নীতি নিবারণ প্রভৃতি সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে অবিরাম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে রত থাকিতে থাকিতে বাঙ্গালা ১৩১১ সালের ১৫ই আশ্বিন তাঁহার জন্মদিনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কার্য্য ব্যতীত এই কালের মধ্যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্য-প্রথা নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তাহা দশম পরিচ্ছেদে তাঁহার জীবন চরিতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রাজবিধির দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াস বহু পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সেই উদ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সেরূপ সহায়তা পান নাই। রাসবিহারী অশিক্ষিত হইয়াও তাঁহার উৎসাহদাতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রতি হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহুদিন সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির অনুকূল বাক্য শোনা যাইতেছে।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

৩১৫ পৃষ্ঠা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ।

রাজনারায়ণ বসু।

প্রকৃত পক্ষে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের মানুষ নহেন। ১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান; এবং সেই সালেই তাঁহার প্রধান কার্য্য আরম্ভ হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ অগ্রেই করা উচিত ছিল। কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ সালের মধ্যে তাঁহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয় জাতীয় চিন্তাতে প্রধান রূপে অনুভূত হয়, এইজন্য এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বসু বংশে, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্ম হয়। এই বোড়ালের বসুরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী ছিলেন। ইংরাজেরা গোবিন্দপুরে যখন বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণ করেন, তখন তত্রত্য বসু পারিবারকে বাহির সিমলাতে এওয়াজি জমি দিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া দেন। কালক্রমে রাজনারায়ণ বসুর প্রপিতামহ শুকদেব বসু, কলিকাতা হইতে উঠিয়া গিয়া বোড়ালে বাস করেন। ইহাঁর পিতামহ রামসুন্দর বসু, দয়া দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পিতা নন্দকিশোর, বসু বংশের সর্ব্বজন-প্রশংসিত গুণসকলের অধিকারী হইয়াছিলেন; এবং তদুপরি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন; এবং কিছুদিন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এরূপ কথিত আছে যে মৃত্যু শয্যাতে শয়ান হইয়া তিনি রামমোহন রায়ের কৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ আনাইয়া পাঠ করাইয়াছিলেন; এবং ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলনগরে ওঁকার জপিতে জপিতে যেমন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল তেমনি ওঁকার জপিতে জপিতে ইঁহারও মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই পিতার সন্তান। বাল্যকালে বোড়াল গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তখন কলিকাতার দক্ষিণ

প্রদেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্দ্ধমানের গুরু দেখা যাইত। এই গুরুরা আসিয়া ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশাল খুলিতেন। একা গুরু মহাশয় খুঁটি ঠেশান দিয়া বেত্র হস্তে বসিতেন, সর্দ্দার ছেলেরা তাঁর সহকারীর কাজ করিত; নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার সাহায্য করিত; গুরুমহাশয়ের পয়সাদি আদায় করিয়া দিত; তাঁহার পাকাদিকার্য্যের সাহায্য করিত; পলাতক বালকদিগকে ধরিয়া আনিত ইত্যাদি। এইরূপ পাঠশালে রাজনারায়ণ বসুর শিক্ষা আরম্ভ হইল।

পাঠশালে কিছু দিন শিক্ষা করার পর, সাত বৎসর বয়সের সময়, পিতা তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিয়া আর এক গুরুর পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া বসুজ মহাশয় বৌবাজারের শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ পাড়ায় ছোট ছোট স্কুল খুলিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শম্ভু মাষ্টার তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধ্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। এই খানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্কুলের বালকগণ মিলিয়া এক সদালোচনা সভা স্থাপন করিল। তাহাতে রাজনারায়ণ বাবু একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন; এবং তাহার এক অধিবেশনে Whether Science is preferable to Literature,—সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান অধিক আদরণীয় কি না—এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় সে দিনকার অধিবেশনে হেয়ার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

হেয়ার তাঁহাকে ফ্রী বালকরূপে হিন্দু কলেজে প্রেরণ করেন। এই হিন্দু কলেজ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু কলেজে গিয়া তিনি একদিকে যেমন প্রতিভাশালী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগের হস্তে পড়িলেন, তেমনি অপর দিকে এরূপ সকল সমাধ্যায়ী বন্ধু পাইলেন, যাহাদের দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষকদিগের মধ্যে সাহিত্যের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন, ও গণিতাধ্যাপক

মিষ্টার রীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। ডি, এল, রিচাডসনের বিবরণ অগ্রেই দেওয়া হইয়াছে। রীজ সাহেব এক সময়ে সুবিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সৈন্য দলে সামান্য একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। তৎপরে নানা ঘটনা ও নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দুকালেজের গণিতাধ্যাপকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গণিতে তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোক প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার সংশ্রবে যে কোন ছাত্র একবার আসিয়াছে সেই তাঁহার গণিত-বিদ্যা-পারদর্শিতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ডরাইতেন; সুতরাং রীজকে যমের মত দেখিতেন।

যাহা হউক এই সময় প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল। অপর দিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশ নাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সহাধ্যায়ী রূপে পাইয়া তাঁহার আত্মোন্নতির বাসনা প্রবল হইল। তাহার ফলস্বরূপ তিনি কলেজের ভাল ভাল পারিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে লাগিলেন।

হিন্দুকলেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। পর বৎসর তাঁহার পিতার দেহান্ত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈষয়িক অবস্থা মন্দ হইলে, উপনিষদ অনুবাদকের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহারও কর্ম্ম গেল। তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাল বসিয়া রহিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়কার স্মরণীয় বিষয় একটী আছে। সংস্কৃত কলেজে যে তিনি কেবল ক্লাসের ছাত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পরবর্ত্তী-সময়-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই সূত্রে রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে উঁহাদের আত্মীয়তা জন্মে।

১৮৪৮ হইতে ১৮৫০ এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত ধর্ম্ম বিশ্বাসে একটী সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটে; তাহাতে রাজনারায়ণ বাবুর একটু হাত ছিল বলিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে;—সে পরিবর্ত্তনটী এই। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; এবং প্রচার করিতেন। কিন্তু ডাক্তার ডফ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তাহার ফল স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও বিচার উপস্থিত হইল। কাশী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়া আসিলে এই বিচার আরও পাকিয়া উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু যখন বেদে অভ্রান্ততাবাদ রক্ষা করা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার ফল স্বরূপ বেদের অভ্রান্ততাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত হইতে পরিত্যক্ত হইল; এবং মানবের ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে নিহিত হইল।

১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান। সেখানে তিনি ১৮৬৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছিলেন। মেদিনীপুরে গিয়া তাঁহার কার্য্যশক্তি অদ্ভুত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। সভার পর সভা এইরূপে এত প্রকার সভা সমিতি করিতে লাগিলেন, যে একবার সেখানকার একজন ভদ্র-লোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে—আপনার সভার জ্বালাতে আমরা অস্থির; এইবার সভানিবারিণী সভা নামে একটা সভা স্থাপন না করিলে আর চলিতেছে না। ঐ সভায় সভ্যদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোটা লইয়া উপস্থিত হওয়া।

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বাবু প্রধানতঃ সাত প্রকার কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন।

(১ম) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন।

(২য়) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ স্থাপন।

(৩য়) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা স্থাপন।

(৪) সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন।

(৫ম) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

(৬) ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন।

(৭) Defence of Brahmoism and of the Brahmo Somaj নামক পুস্তিকা প্রণয়ন।

ইহার প্রত্যেকটীর জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে তাঁহার পূর্ব্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে স্কুলটীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে উন্নতির স্পৃহা দৃষ্ট হয় নাই। বসুজ মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ করিলেন। একদিকে শিক্ষকগণের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; অপরদিকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী করিয়া তুলিলেন। তিনি তাঁহার আত্ম-জীবন চরিতে বলিয়াছেন যে তিনি প্রথম প্রথম ছাত্রদিগকে শারীরিক শাস্তি দিতেন; কিন্তু ত্বরায় সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন যে শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা বালকদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিলে অধিক কাজ করা যায়। সেইরূপে তিনি তাহাদিগকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার ফল আমরা পরবর্ত্তী সময়ে দেখিয়াছি। অতি অল্প ছাত্রকেই গুরুর প্রতি এরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে দেখিয়াছি। উত্তর কালে তাঁহার ছাত্রদিগের অনেকে কৃতী ও যশস্বী হইয়া নানা বিভাগে নানা কার্য্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মেদিনীপুরের ও রাজনারায়ণ বাবুর স্মৃতি হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই ছাত্রেরাই উত্তর কালে উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের গুরুভক্তির চিহ্নস্বরূপ মেদিনীপুরে একটী আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ স্থাপন। কোন্‌নগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরে ডিপুটী কালেক্টরের কাজ করেন, তখন তাঁহার উদ্যোগে সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু শিবচন্দ্র বাবু কর্ম্মসূত্রে সে স্থান পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে পদার্পণ করিয়াই ১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; এবং নিজেই তাহার উপাসনাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে গেলে এতৎসংক্রান্ত কার্য্যই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত; এই সমাজের সংস্রবে

তিনি যে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। ইহা স্মরণীয় ঘটনা যে তাঁহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অচির কালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে মেদিনীপুর বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। বসুজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইলেন। অনুমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে কৃষ্ণধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যুবকের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইল। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে গমন করিলেন; এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে অনুষ্ঠানের তরঙ্গ দেশের অপরাপর দূরবর্ত্তী স্থানেও অনুভূত হইল।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বাস কালের প্রধান কার্য্য "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন। এই গ্রন্থ তিনি ১৮৫৩ সালে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়াই তিনি গুরুতর শিরঃপীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জন্মের মত অসুস্থ হইলেন। এই গ্রন্থে যে প্রভূত গবেষণা ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা। দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এতৎসংস্রবে তিনি ইংরাজীতে "A society for the promotion of national feeling among the educated Natives of Bengal, নামে এক প্রস্তাবনা পত্র বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ প্রস্তাবনা পত্র পাঠ করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার ভাব উদিত হয়। এই জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা সংক্রান্ত একটী কৌতুকজনক স্মরণীয় বিষয় আছে। সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের বাড়াবাড়ি দেখিয়া উক্ত সভার সভ্যগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাঁহারা পরস্পরের সহিত আলাপে বা চিঠি পত্রাদিতে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা

ভাষা ব্যবহার করিবেন; পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে good morning, বা good nightএর পরিবর্ত্তে "সুপ্রভাত ও "শুভরজনী" বলিবেন; কথা বার্ত্তা কহিবার সময় বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী মিশ্রিত করিবেন না; যদি কেহ ভুল ক্রমে ওরূপ করেন, তবে প্রত্যেক ইংরাজী বাক্যের জন্য এক এক পয়সা জরিমানা দিতে হইবে।

সুরাপান-নিবারিণী সভার বিষয়ে এইটুকু স্মরণীয় যে রাজনারায়ণ বাবুর প্রভাবে মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে সুরাপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে জন্য নাকি তাঁহার প্রতি মাতালদিগের মহা আক্রোশ উপস্থিত হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তাঁহারই উদ্যোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দুর্গানারায়ণ এবং তাঁহার মধ্যম সহোদর মদনমোহন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে বিধবা-বিবাহ করেন।

১৮৬৬ সালের মার্চ্চ মাসে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশতঃ তাঁহার মাথা ঘুরুণি আরম্ভ হইল। একদিন তিনি আর মাথা লইয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই শিরঃপীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবসৃত হইয়া প্রথমে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন। তিনি কলিকাতাতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র নব্য ও প্রাচীন ব্রাহ্মদল তাঁহাকে ঘিরিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে না হইতে তাঁহার আবার শ্রম আরম্ভ হইল। অতঃপর তিনি সাত প্রকার কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন ঃ—(১ম) ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা নিবারণের প্রয়াস; (২য়) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা; (৩য়) সে কাল এ কাল বিষয়ে বক্তৃতা; (৪র্থ) হিন্দুকালেজ ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের সম্মিলনীর আয়োজন; (৫ম) বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা; (৬ষ্ঠ) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (An old Hindu's Hope) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ; (৭ম) সারধর্ম্মবিষয়ে গ্রন্থ রচনা।

ইহার সকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গসমাজে অনুভূত হইয়াছিল; এবং কোন কোনওটীর শক্তি বহুদূর ব্যপ্ত হইয়াছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় অনুগত শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সমক্ষেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (Brahmic Caution, Advice and Help) নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার

ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে সাবধান করেন; এবং ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নর পূজা নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু এই কালের মধ্যে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা লোকের দৃষ্টিকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল এরূপ অল্প বক্তৃতার ভাগ্যে দেখা গিয়াছে। ঐ বক্তৃতা যে কারণে ও যে প্রকারে প্রদত্ত হয় তাহা অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। ১৮৭১ সালে ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে তদানীন্তন ট্রেনিং একাডেমির গৃহে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা ঐ বক্তৃতা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল; এবং ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে, এবং কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ তদুপলক্ষে তাঁহারা নিজে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু ঐ বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তি-সঙ্গত ও জাতীয়-ভাব-পূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল। আমার স্বর্গীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সোম-প্রকাশে" লিখিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন; সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি বলিয়া বরণ করিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন; সুদূর মাদ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আসিতে লাগিল; এবং ইংলণ্ডে টাইমস্ পত্রিকাতে ঐ বক্তৃতার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংসা বাহির হইল। রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেশব বাবুর পক্ষ হইয়া আমরা কয়েক জন তদুত্তরে বক্তৃতা করিলাম, কিন্তু সে কথা যেন কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না; বরং কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অহিন্দু বলিয়া হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন।

১৮৭৫ সালে মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের "এমারেল্ড বাউয়ার" নামক উদ্যানে হিন্দু কালেজ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের ভূত-পূর্ব্ব ও তদানীন্তন ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু তাহার প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ঐ সভাতে "হিন্দু কালেজের ইতিবৃত্ত"

বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে আমরা হিন্দুকালেজের প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক কথা প্রাপ্ত হই।

১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দেওঘর নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গিয়া বার্দ্ধক্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বে ও দেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি "An Old Hindu's Hopes—"একজন প্রাচীন হিন্দুর আশা" নামে ইংরাজীতে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে স্বদেশবাসিগণকে এক মহাহিন্দু-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। ঐ গ্রন্থ অনেকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বলিতে গেলে তাহাকে পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অথবা মহাধর্ম্ম-মণ্ডল নামক সভার পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে। তাহাতে যে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের উদ্দীপনা দেখা যায় তাহা অতীব স্পৃহণীয়।

ইহার পরে তিনি 'তাম্বুলোপহার' নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; এবং সর্ব্বশেষে সারধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে ইংরাজীতে এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে দেখা যায় যে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও উদার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর বস্তুতঃ এই সময়ে তাঁহার নিকটে বসিলে একদিকে তাঁহার ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, অপরদিকে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্ব কালের সাধু ভক্তগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইত। এক সময়ে তিনি ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছেন; পরক্ষণেই হাফেজের বচনাবলি উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন; আবার হয়ত তৎপরক্ষণেই মাদাম গেওঁর উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-সুধাবনে ভৃঙ্গের ন্যায়, ফুলে ফুলে মধুপান করাই তাঁহার প্রধান কাজ।

এরূপ অবস্থাতে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের, মানুষের পূজিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা উপস্থিত—"মশাই কি বৈদ্যনাথে যাবেন?" উত্তর—"হাঁ যাব।" প্রশ্ন—"আপনার পাণ্ডা কে?" উত্তর—"রাজনারায়ণ বসু।" পাণ্ডা হাসিয়া বলিল—"ও ত আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ"। তাঁহার শেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিয়া দেখি তাঁহার শুশ্রূষার জন্য একজন খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু নিযুক্ত আছেন; এবং একজন

হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার কাছে কয়েক দিন থাকিবার জন্য বৈদ্যনাথের নিকটস্থ তপো পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যে তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লইয়া তাঁহার গলে দিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমরা তোমার তুলনায় কিছুই নহি।"

এইরূপে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের, সর্ব্বজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে তিনি গতাসু হন। ইনি রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সম্মানিত বন্ধু ছিলেন।

আনন্দ মোহন বসু।

চরিত্রবান মানুষই একটা জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্ দেশে কত ধন ধান্য আছে, তাহা দিয়া সে দেশের মহত্ত্বের বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত চরিত্রবান্, গুণী, জ্ঞানী, মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এই সকলের দ্বারাই সেই মহত্ত্বের বিচার। বঙ্গদেশ যে নব্যভারতে গৌরবান্বিত হইয়াছে তাহা ইহার ধন ধান্যের জন্য কখনই নহে। যে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম দিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানুষ দেখা দিয়াছে, যে দেশে দেবেন্দ্র নাথের ঋষিত্ব, কেশবের বাগ্মিতা, রাজেন্দ্র লালের পাণ্ডিত্য, মহেন্দ্রের সত্যানুরাগ, বঙ্কিমের প্রতিভা, কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব, আরও ছোট বড় কত কত ব্যক্তির মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে দেশ কি লোকচক্ষে বড় না হইয়া যায়! আনন্দ মোহন বসু, শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গৌরবান্বিত দলের একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। নবাবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি একজন প্রধান পুরুষ। সুতরাং তাঁহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে যাইতেছি :—

আনন্দমোহন পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মলোচন বসু। পদ্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী কাজ করিতেন; এবং পদে ও সম্ভ্রমে বড় লোক ছিলেন। হরমোহন ও মোহিনী মোহন নামে পদ্মলোচন বসু মহাশয়ের আর দুই পুত্র ছিলেন; হরমোহন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং মোহিনী মোহন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, আনন্দমোহন দ্বিতীয়।